লুই জে বাটন

web

বজ্রঝড়

লুই. জে. বাটন

বজ্রঝড়

[থাণ্ডার স্টর্ম্‌ গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর]

Library

অনুবাদ

মীর ফখরুল কাইয়ুম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১
মে ১৯৮৪

বাএ ১৪৪৪

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০ কপি

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ/২৯/৮৩-৮৪

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
সলিমাবাদ প্রেস
২১/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রীট
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ মোহসীন

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা।

২৫৭-৪

BANSDOC Library
Accession No. 65566
Date 16-06-

BAZRA JHAR : Bengali Translation of Lui J. Buton's *Thunder Storms*. Translated by Mir Fakhrul Quyyum. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, First Edition 1984. Price Tk. 35·00. U. S. Dollar 4·00

সূচনা

একথা নিবিঘ্নে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর জীব জগতের সূচনার প্রারম্ভকাল থেকে বজ্রবড় একটা বিস্ময়কর বস্তু বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ থেকে যে বৃষ্টি হয় তা গাছপালার পুষ্টি ও জীবন ধারণের সহায়তা করে। অবশ্য কখনও বা এ ঝড়েরই প্রচণ্ড বাতাস, প্রবল বৃষ্টিপাত বা বড় ধরনের শিলাবৃষ্টির দ্বারা এসব বৃক্ষই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। বড় ধরনের বজ্রপাতের শব্দ ছোট ছেলেমেয়ে ও ভীতু লোকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে। বিজলী দ্বারা সময় সময় বন ও ঘরবাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং কখনও বা এর ফলে বহু মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যুও ঘটে থাকে।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা যুগ যুগ ধরে বজ্রঝড় এবং এ থেকে যে আবহাওয়ার সূচনা হয় তা জানবার ও বুঝবার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিজলীপাত সম্পর্কীয় গবেষণা এবং আরও মুষ্টিমেয় কতগুলো কাজ বাদ দিয়ে ত্রিশ বছর আগে পর্যন্তও বজ্রঝড় সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। রাডার ও আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং বিমানের নানা ব্যবহার দ্বারা আজকাল বজ্রঝড় সম্পূর্ণভাবে বুঝবার জন্যে যে-সব পরিমাপক প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হচ্ছে।

নানারূপ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিগুলোর ক্রমাগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রঝড় ও সমস্ত বায়ুমণ্ডল সম্পর্কীয় গবেক্ষণার ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই উজ্জ্বল হয়ে আসছে। আজকাল আবহাওয়া বিষয়ক কৃত্রিম উপগ্রহের কথা প্রায় সবাই জানেন। এখন আর কেউ উপগ্রহের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় না। এ থেকে যে-সব পর্যবেক্ষণমূলক সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তা সত্যই আশ্চর্যজনক এবং এসব তথ্য পূর্বে কখনও জানা যায়নি। দ্রুতগামী (বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কের) কমপিউটার দ্বারা আজকাল অসংখ্য পর্যবেক্ষণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। এই যন্ত্র দ্বারা বায়ুমণ্ডলের গতি সংক্রান্ত দুরূহ সমীকরণগুলো পর্যন্ত সমাধান করা যায়।

BANSDOC Library
Accession No. 18566

এগুলো সব কিছুর জন্যেই আজ আবহাওয়া বিজ্ঞান দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আবহাওয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সত্যের সন্ধানে যে-সব দিশারী যুগ যুগ ধরে জ্ঞানান্বেষণ করে গেছেন তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে আজকের এ উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর হোত না। একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রটি সত্যি উর্বর। আপনারা যাঁরা এর চেয়েও নতুন ধরনের কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁরা ইচ্ছা করলে হয়তো বা অন্যান্য গ্রহের বায়ুমণ্ডলের গবেষণার কাজ হাতে নিতে পারেন।

এই ছোট গ্রন্থে আমরা বজ্রঝড়ের বর্ণনা দিয়েছি। বজ্রঝড় বায়ুমণ্ডলীয় বিষয়গুলোর মধ্যে শুধুমাত্র একটা সামান্য অংশ মাত্র। এ ঝড় সম্পর্কে জানতে যে-সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করতে যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় এ গ্রন্থে শুধুমাত্র সেগুলোই সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে দেখা যাবে যে, বজ্রঝড়ের বেশ কিছু কারণ এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। আমরা আশা করি এ-সমস্ত সমস্যা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করবে এবং তারা আবহাওয়া বিজ্ঞানী হয়ে কোন-দিন প্রকৃতির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি করবে।

পরিচিতি

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিক করে সমস্ত স্বয়ংক্রীয় যন্ত্রপাতি কাজ করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় কালো জমের মতো মেঘের থাবার মধ্যে বৈমানিক বিমান নিয়ে প্রবেশ করল। মানুষ এবং বিমান এবার প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর ও সন্ত্রাসপূর্ণ পরিবেশের কৃপার উপর নির্ভরশীল।

যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থার বজ্রঝড় পরিকল্পনা ও জাতীয় মারাত্মক ঝড় পরিকল্পনার দুঃসাহসী বৈমানিকদের এই বিরাট রোমাঞ্চকর অভিযানের ফলে বজ্রঝড়ের প্রকৃতি সম্পর্কে মূল্যবান সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

আবহাওয়াবিদ লুই. জে. বাটন পনের বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত বজ্রঝড় সম্পর্কীয় গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ঝড় সৃষ্টিকারী মেঘ, বায়ু, বজ্র ও শিলা সম্পর্কে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত কতটুকু তথ্য উদ্‌ঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছে তিনি তা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের আধুনিকতম পরীক্ষণ কার্যের বর্ণনা করতে গিয়ে মেঘে থেকে বৃষ্টিপাত সৃষ্টির কথা থেকে শুরু করে উর্ধ্বমণ্ডলে বিস্ফোরকবাহী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় ঝড়ের কিউমুলাস কনজেসটাস অবস্থা থেকে শুরু করে মারাত্মক বজ্রঝড়ের ধ্বংসাত্মক ফিনকি বায়ুর কথাও এখানে উল্লেখ করেন।

বজ্রঝড় এক প্রকার বিশদৃশ্যপূর্ণ সন্ত্রাসের মতো। এই বই থেকে বোঝা যায় যে, এগুলো কি, কেমন করে তৈরী হয় এবং কিভাবে সংঘটিত হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা কেবল বুঝতে শিখ্‌ছি মাত্র।

অনুবাদক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১-২০

বজ্রঝড়ের মধ্যে বিমান চালনা। বজ্রঝড় পরিচালনায় বিমান চালনার নিয়মাবলী। বিরাট রকমের ধাক্কা। উড্ডয়নের পরবর্তী আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ২১-৩৪

বজ্রঝড় কেন হয়? বজ্রঝড়ের স্থানান্তর শক্তি। পরিচলন—জলীয় বাষ্প এবং শক্তি। বায়ুপ্রবাহ (Drafts) ও দমকা হাওয়া। দুই ধরনের বজ্রঝড়।

তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৩৫-৫১

স্থানীয় বজ্রঝড়। অস্থিতিশীল বায়ু। একটা বজ্রঝড় তৈরীর সময়। পরিণত অবস্থার বজ্রঝড়। বজ্রঝড়ের নিরসন অবস্থা। একটি দীর্ঘজীবী ঝড়।

চতুর্থ অধ্যায় পৃষ্ঠা ৫২-৭২

সারিবদ্ধ ও মারাত্মক বজ্রঝড়। সারিবদ্ধ ঝড়। মারাত্মক বজ্রঝড়ের পরিণত অবস্থা। সারিবদ্ধ বজ্রঝড়ের সম্প্রসারণ। বায়ু ও বজ্রঝড়।

পঞ্চম অধ্যায় পৃষ্ঠা ৭৩-৮৯

বজ্রঝড়ের অভাবে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানের আবহাওয়া। বজ্রঝড়ের বৃষ্টি। ঝড়ের আগের দমকা হাওয়া। বজ্রঝড়ের নীচে তাপমাত্রা। বজ্রঝড়ের নীচে চাপের তারতম্য। সারমর্ম।

ষষ্ঠ অধ্যায় পৃষ্ঠা ৯০-১১৭

বিজলী ও বজ্রপাত। বজ্রঝড়ের বৈদ্যুতিক গঠনাবলী। বজ্রমেঘ চার্জ করার পদ্ধতি। বিজলীপাত পর্যবেক্ষণ। বিজলীপাত। বজ্র।

সপ্তম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১১৮-১২৯

ঝড় বশীভূত করার প্রচেষ্টা। বজ্রঝড়ের গঠন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। বৈদ্যুতিক চার্জ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। ক্ষতিকারী শিলাপাত প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টা। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত রোধ করার প্রচেষ্টা। সারমর্ম।

অষ্টম অধ্যায় পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৫

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

প্রথম অধ্যায়

বজ্র ঝড়ের মাঝে বিমান চালনা

প্রতিটি জীবনই কতগুলো প্রয়োজনীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ। আজকের বাসনা প্রায়ই কালকের কার্যাবলীর চেয়ে অনেক বড় মনে হয়। বহু ধারণা ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা মানুষ কখনও বা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে থাকে। আপনাকে যদি কেউ হঠাৎ করে প্রশ্ন করেন চট করে বলুন দেখি ১৯৫৫ সালে আপনার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি? আপনি তার উত্তরে কি বলবেন? অনেকেই এ ধরনের উত্তর দিতে বেশ বিচলিত হয়ে যাবেন।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্মরণশক্তি থেকে ক্রমশঃ স্বল্প প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলো সরে যেতে থাকে। শুধুমাত্র কতকগুলো প্রয়োজনীয় ঘটনা মানুষ কখনও ভুলতে পারে না এবং যে-কোন মুহূর্তে সেগুলো স্মরণ করতে পারে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম ওহিও-তে আমরা কয়েক জনে এ ধরনের একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। আমরা কখনও তা ভুলতে পারব না।

এ দিনটিও শুরু হয়েছিল মধ্য-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন দিনগুলোর মতই। গরম ও আর্দ্রতা সেদিন বেশ একটু বেশী ছিল যা হয়তো বা শহরের লোকদের খুব একটা পছন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু ঐ আবহাওয়া ফসলের জন্য ছিল খুবই ভাল। দুপুরের পূর্বেই বেশ মেঘ ঘনিয়ে আসছিল মনে হল বৃষ্টি হবে। হ্যাঁ—চাষীদের এতে খুশী হবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। ঠিক জেনিয়া (xenia) শহরের বাইরের ক্লিনটন কাউন্টি (সামরিক) বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে আর এক ধরনের মানুষ তখন কিন্তু বেশ স্বস্তির সঙ্গে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এঁদের সবার পরনে বৈমানিকের পোশাক ও হাতে আলগা-ভাবে ঝুলছে বিমান বাহিনীর প্রতীক-চিহ্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসিদ্ধ এবং বর্তমানে পরিত্যক্ত মসৃণ কালো রঙের জমজ লেজবিশিষ্ট P—61 (পি-৬১) বিমানগুলো যেন বিধবা নারীর মত

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিমান ঘাঁটিতে। এখন আর এগুলো মেশিনগান বা যুদ্ধের অন্য সরঞ্জাম বহন করে না। এসব বিমান থেকে যে সব যন্ত্র সরিয়ে নিয়ে এখন তা দিয়ে এক নতুন শত্রুর মোকাবেলা করা হয়। এ শত্রুর নাম হল—বজ্রঝড়।

বিমান চালনার সূচনা থেকেই বজ্রবাহী মেঘ সব মেঘের চেয়ে মারাত্মক বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সব বিমান বজ্রবাহী মেঘের চূড়ায় গিয়েছে কচিৎ তার মধ্য থেকে দু' একটা হয়তো বা আস্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। বজ্রবাহী মেঘের সর্বনাশা বাতাস পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী লোককেও ভয় পাইয়ে দিতে পারে। এর পরে রয়েছে বিজলী ও শিলার প্রাদুর্ভাব। ক্রমশঃ বিমানের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে বজ্রঝড় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা ততই বেড়ে যাচ্ছে। এ প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়ে এখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে—এ সম্পর্কে একটা কিছু না করে আর উপায় নেই। এ বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। এসব ঝড়ের বেগ কতটুকু পর্যন্ত হতে পারে? সবচেয়ে বেশী 'Turbulence' সহ্য করতে পারে এ ধরনের বিমান কতটুকু শক্তিশালী করে তৈরী করা যেতে পারে। ঝড়ের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য সবচেয়ে বেশী 'Turbulence'-এর যায়গা কি করে বাদ দিয়ে বিমান চালনা করা সম্ভবপর? হঠাৎ করে কোন বিমান বজ্রঝড়ের মাঝে পড়ে গেলে বৈমানিককে কি করে বিমান চালনা করতে হবে?

বিমান চালক, বিমান পরিকল্পক এবং বিমান প্রস্তুতকারকদের জন্য এসব প্রশ্নের উত্তর বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরা সবাই এসব জবাবের জন্য আবহাওয়াবিদদের মতামত জানতে এসে দেখলেন যে তাঁরাও এসব প্রশ্ন এবং আরও কতগুলো প্রশ্নের সমাধান অন্বেষণ করছেন। কেন বিশেষ কতগুলো দিনে বজ্রঝড় হয় এবং অন্য দিনগুলোতে শুধুমাত্র অল্প মেঘের সৃষ্টি হয়? প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার শক্তির উৎস কি? কেন কোথায় এবং কি কারণে ঝড় হয়? কোন্ উচ্চতায় ঝড় সবচেয়ে বেশী তীব্রতা অর্জন করে? বিজলী ও শিলার কারণ কি? এ রকম আরও বহু প্রশ্ন।

অবশ্য দু' হাজার বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বজ্রঝড় এবং তা থেকে যে চরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বহু কৃতি ব্যক্তির মনযোগ আকর্ষিত হয়ে আসছে। বেশীর ভাগ সময়েই ভূমি থেকে এসব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হত। তখন লোকে শুধু যা চোখে দেখতো তাই জানতে পারত মাত্র। ক্রমশঃ মানুষ পাহাড়ে উঠে এগুলো আর একটু ভাল করে দেখতে শুরু করলো। এর পর আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে বজ্রবাহী মেঘের বৈদ্যুতিক গুণাবলী জানার প্রচেষ্টা শুরু হল। এসব কাজ থেকে নতুন নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এগুলো সবই এই বিরাট বিষয়ের সূচনা মাত্র।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা দেশের বৈজ্ঞানিকরা নানা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বজ্রঝড় সম্পর্কে কাজ শুরু করেন। শুধুমাত্র কার জন্য বিজলীর সৃষ্টি হয় তাই নয়, বরং কি কারণে এই সব ঝড় হয় এ সম্পর্কে ঐ সময় গবেষণা চলতে থাকে। বিমান আবিষ্কারের পর থেকে বজ্রঝড় সম্পর্কে আরও উন্নতমান জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। ঝড়ের মধ্যে বিমান এবং বিমান চালক হারিয়ে যায় এমন কি বিমান বন্দরে রাখা বিমানগুলো পর্যন্ত প্রচণ্ড ঝড় ও দমকা হাওয়ায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৩০ সালের দিকে 'রেডিও সণ্ডে' নামক একটি পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে তা আবহাওয়া-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যে লাগানো হয়। তাপ-মাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ুর চাপ নির্ণয় করা যায় এমন একটি ছোট যন্ত্র বেলুনের সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হত। বাক্সটা বায়ুমণ্ডলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট ট্রান্সমিটারের সাহায্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি বেতার-যোগে ভূমিতে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। রেডিও সণ্ডের দ্বারা আবহাওয়া বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হয়।

ভূসংলগ্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা ঝড়ের নানা অবস্থাগুলো মাপা যায়। রেডিও সণ্ডে যন্ত্রের সাহায্যে ঝড়ের চারদিকের তাপ ও আর্দ্রতা মাপা সম্ভবপর। কখনও বা এ ধরনের বেলুন বজ্রঝড়ের মধ্যে প্রবেশ করলে ঝড়ের মধ্যবর্তী বায়ুর গতি সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সে অবস্থা খুবই বিরল বলে এ পদ্ধতিতে ঝড়ের গঠন সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়।

এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও বজ্রঝড় একটা বিরাট রহস্যের বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হয়ে আসছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চালনা সংস্থা ও আবহাওয়া বিভাগ বজ্রঝড় সম্পর্কে মানুষের সীমিত জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন ও চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়। বজ্রঝড়ে জঙ্গী ও বাণিজ্যিক বিমান ধ্বংসের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত এর একটা সুরাহা করার জন্য চারদিক থেকে চাপ পড়তে থাকে। অবশেষে এর জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে একটি বড় গবেষণা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বিমান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এ পরিকল্পনাটি সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগের উপর এই কার্যভার ন্যস্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ও অন্য আরও কতগুলো সরকারী বিভাগ এ পরিকল্পনার জন্য সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

হোরস আর বায়ারকে এ কাজের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে তাকে কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করে এ কাজের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপের সূচনা হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বায়ার ছিলেন বিমান চালনার জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ের অন্যতম দিশারী। বজ্রঝড়ের ধ্বংসাত্মক ক্ষতির উল্লেখ করে ডঃ বায়ারই সর্বপ্রথম তা—সরাসরিভাবে আলোচনা করতেন। বহু বছর ধরে তিনি এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন অনুসারে একটি গবেষণা গ্রহণের জন্য নানারূপ বিতর্ক ও যুক্তির উল্লেখ করে আসছিলেন। ডঃ বায়ার যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া বিভাগের এস. পি. হ্যারিসন ও অন্যান্য পরামর্শদাতার সহায়তায় একটি উচ্চাভিলাষী এবং দুঃসাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ যন্ত্র বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব যন্ত্রপাতি বসানো ও প্রত্যহ পর্যবেক্ষণের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক পারদর্শী লোকের প্রয়োজন। এর দ্বারা বজ্রঝড়ের মাঝে ও চারদিকের অনেক তথ্যাদি জানা যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে বিমান পারদর্শীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর সমাধান পাওয়া সম্ভবপর

নয়। বিমান পারদর্শীদের জন্য প্রয়োজন মেঘের ভিতরের Turbulence সম্পর্কীয় তথ্যাদি। কিন্তু আপনি কিভাবে Turbulence মাপবেন? কি করে জানবেন যে কখন এবং কোন সময়ের বজ্রঝড় বিমানের পাখাগুলো বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে? এ প্রশ্নটি কিছুটা সরলভাবে প্রকাশ করা হল। বজ্রঝড়ের ভিতরে কি আছে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সে সম্পর্কে মানুষের কিছু জানা ছিল না। বজ্রঝড়ের মাঝে বিমান প্রবেশ করলে কখনও বা মাত্র দু' একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বেরিয়ে আসতে পারে আবার কখনও বা এর ফল হয় সত্যি দুঃখজনক। এ কাজের জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। এর জন্য যে-কোন মানুষের এ ধরনের অবস্থায় বিমান চালনার ভবিষ্যৎ সত্যি সঙ্কটময় হতে পারে।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে বৈমানিক ও আবহাওয়া-বিশারদদের মতামত নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তটি হল এই যে বজ্রঝড়ের মাঝে বিমান চালানো হবে। শুধুমাত্র ছোট ধরনের ঝড়ের মধ্যে অর্থাৎ যার চূড়া ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত বা তার চেয়ে আরও বড় বড় ঝড়ের অর্থাৎ যেগুলোর চূড়া 'stratophere'-এর ভূমি স্পর্শ করেছে এবং যার উচ্চতা প্রায় ৫০,০০০ ফুট সেগুলোর মধ্যেও বিমান চালানো হবে। এতে অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন 'এটা কি সত্যি প্রয়োজন? চুলো কত গরম জানবার জন্য কি চুলোতেই ঝাঁপ দিতে হবে?'

তখনকার অবস্থা ও আজকের জন্য বজ্রঝড়ের Turbulence ভালভাবে জানতে হলে এসব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হবে হ্যাঁ—প্রকৃতপক্ষেও তাই করতে হবে এবং নিশ্চিতভাবেই একথা সত্য। শুধুমাত্র বিমান নিয়ে—এগুলোতে একবার করে প্রবেশ করলেই চলবে না—এ কাজের জন্য বহুবার বিমান নিয়ে এসব ঝড়ে প্রবেশ করতে হবে। অবশ্য এজন্য উপযুক্ত ধরনের বিমান ব্যবহার করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এসব কাজের জন্য যে-সব লোকের দরকার তাঁদেরকে হতে হবে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পারদর্শী বৈমানিক।

১৯৪৫ সালের বসন্তকালের মাঝেই কাগজে কলমে এ কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর পরবর্তী পদক্ষেপে বহু সংখ্যক পারদর্শী

আবহাওয়া পর্যবেক্ষক, কারিগর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বিমান ও সর্বশেষে বৈমানিক সংগ্রহ করার দায়িত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৫ সালে বসন্তকালে কংগ্রেস—আবহাওয়া বিভাগকে জুলাই মাসে এ গবেষণার কাজ শুরু করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। এরপর ভাগ্যচক্র অদ্ভুতভাবে ঘুরে গেল ঃ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ১৬ তারিখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার মাঝ দিয়ে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও বেশী লোকের জীবনে স্বস্তির ইঙ্গিত এল। ডঃ বায়ার ও অন্যান্য যাঁরা ‘বজ্রঝড়’ পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের কাছে এ সংবাদ দ্বিগুণ আনন্দ বহণ করে আনলো। এ সময়ে পৃথিবীর সমস্ত স্থান থেকে আবহাওয়াবিদ, কারিগর, আবহাওয়া পর্যবেক্ষক এবং রাডার বিশেষজ্ঞরা ফিরে এলেন দেশে। এঁরা সবাই তখন ভাল কিছু কাজের খোঁজে ব্যস্ত ছিলেন। এধরনের বেশীর ভাগ লোকের বয়সই তখন বিশের কোঠায় এবং মনে সবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এ সব প্রবীণের সমাবেশে বজ্রঝড় পরিকল্পনার মূল কেন্দ্র গঠন করা হয়।

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ফলে আবহাওয়া সংক্রান্ত বহু যন্ত্রপাতি যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশের অন্যান্য দেশ থেকে সংগ্রহ করার সুবিধা অনেক বেড়ে যায়। এ কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হল বিমান সংগ্রহ করা। বিমান বাহিনী যখন ঝড়ের মধ্যে বিমান চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারটি বেশ কড়াকড়িভাবে পরিচালনা করে থাকে। এসব ব্যাপারে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বেশ ছোট ধরনের বিমানে শুধুমাত্র বৈমানিক এবং আর মাত্র দু’ একজন লোক নিয়ে কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রারম্ভিক পরিকল্পনায় শুধুমাত্র একজন বৈমানিক এবং রাডার ও অন্যান্য বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য আর একজন লোক নিয়ে কাজ শুরু হয়। এসব কাজের জন্য যথেষ্ট চাপ সহ্য করার মত তৈরি বিশেষ বিমান ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব বিমানকে ২৫,০০০ ফুট উপরে উড়বার মত শক্তিসম্পন্ন হতে হবে এবং এগুলোর উপরে উঠবার শক্তিও হবে বেশ দ্রুতগামী। সমসাময়িক বিমানগুলো সম্পর্কে অনুধাবন করে ডঃ বায়ার ও বিমান

বাহিনীর কর্তৃপক্ষেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমারু বিমান বা বহুজনবিদিত কালো বিধবার মত দেখতে পি-৬১ বিমানগুলো সন্তোষজনকভাবে এ কাজ করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্বে এগুলো আবহাওয়া পর্যবেক্ষক বিমান হিসাবে ব্যবহার করা হত এবং এ ধরনের বেশ কিছু সংখ্যক বিমান সহজেই সংগ্রহ করা গেল। বিমান বাহিনী এ কাজের জন্য দশটি বিমান হস্তান্তর করে। প্রতিবারে এক সঙ্গে পাঁচটি করে বিমান আকাশে উঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব বিমান বজ্রঝড়ের মাঝদিয়ে পরস্পরের মধ্যে ৫০০০ ফুট দূরত্ব রক্ষা করে পরিচালনা করতে হবে। এর পরের সমস্যা হল এধরনের বৈমানিক সংগ্রহ করা যাঁরা এসব প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে প্রতিদিন বিমান চালনা করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবেন না।

শুধুমাত্র ইচ্ছুক লোক হলেই চলবে না—এঁদের সামর্থ্য বিবেচনা করাও বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এ কাজের অনেক কিছুই এসব বৈমানিকের উপর নির্ভরশীল। ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের কাজে নানা বয়সের বহু যুবক ও যুবতীর অনেকেই বহু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন। মহাশূন্যে যাবার জন্য যেমন মানুষ পেতে অসুবিধা হয়নি ঠিক তেমনিভাবে এ কাজের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন বৈমানিক সংগ্রহ করতেও মোটেই বেগ পেতে হয়নি। আমরা যদি কখনও বুধগ্রহ বা চাঁদে যেতে চাই তখনও ঐ ধরনের কাজের জন্যও মানুষের অভাব হবে না এবং হয়তো এ সমস্ত যুবকের অনেকেই এসব কাজের জন্য হবেন আদর্শ ব্যক্তি, যথেষ্ট বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, দৈহিক ও মানসিক দিকে সবল এবং নিজেদের সামর্থ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসী।

বিমানবাহিনী তাদের সবচেয়ে ভাল বৈমানিকদের মাঝে এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবকের আহ্বান জানালো। সাড়া পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই। এইভাবে প্রথম শ্রেণীর বৈমানিক ও নাবিকদেরকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হল। এসব বৈমানিকের সবারই ছিল আবহাওয়া সম্পর্কে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা এবং এঁদের অনেকেই যান্ত্রিক বিমান চালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকতায় পূর্বেও নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৪৬ সালের বসন্তকালের মধ্যেই বজ্রঝড় পরিকল্পনার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বিচক্ষণ ব্যক্তি ও বহু সংখ্যক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার কাজটি সম্পন্ন হয়। এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দু'টি বিভিন্ন কার্য ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথম কাজটি নিয়োজিত হবে ফ্লোরিডার গ্রীষ্মকালীন বজ্রঝড়ের জন্য। অর্লাণ্ডোর সামরিক বিমান ঘাঁটিতে এ গবেষণা পরিচালিত করার মত সমস্ত সুবিধা ছিল বলে ফ্লোরিডাতে প্রথমে ১৯৪৬ সালের কার্যাবলী পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পরের বছর দক্ষিণ-পশ্চিম অহিও-র ক্লিনটন সামরিক বিমান ঘাঁটি থেকে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেতে হলে—এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফ্লোরিডা থেকে অহিও-তে শুধুমাত্র এ পরিকল্পনার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করতে ২২-টি রেল গাড়ী ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও আরও বহু জীপ, ট্রাক ও রাডার যন্ত্রপাতি বহনকারী ট্রেইলার (Trailer) ও স্থানান্তরিত করতে হয়। পরে অন্য অধ্যায়ে আমরা ফ্লোরিডা অহিও-র পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব। এখন আমি আপনাদের সামনে এ গবেষণার কতগুলো দিক তুলে ধরবো এবং পরে আপনাদেরকে ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্টের সে গল্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বজ্রঝড় পরিকল্পনায় বিমান চালনার নিয়মাবলী

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের প্রারম্ভেই পরিকল্পনার পি-৬১ বিমান চালনার নিয়মাবলী ঠিক করে ফেলা হয়। এর পরবর্তীকালে এবং সমস্ত কাজটি ধরে বিভিন্ন ধরনের বিমান চালনা-পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা হয়। সুষ্ঠুভাবে বায়ুর গতি এবং ঝড়ের মধ্যেকার তাপমাত্রা নির্ণয় করাই ছিল এসব পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিমানে বসানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত এবং সংগ্রহ করা শুরু হল। এ কাজের জন্য একটি বিশেষ ধরনের তৈরি তাপমাত্রা যন্ত্র বিমানের 'Fuselage'-এর উপর ছোট্ট একটা কুঠরির মধ্যে বসানো হল। এই তাপমাত্রা যন্ত্রের প্রকৃত সগ্রাবহি হিসেবে একটি বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধক (Electrical Resistance) তার ব্যবহার করা হয়।

এই তারের বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকতা তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল এ যন্ত্রটি একবার নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে কাজ করে যেতে পারে। (Sensing element) বায়ুর গতি নির্ধারণের জন্য বিমানকেই সজ্ঞাবহি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিমানের বিভিন্ন অবস্থান নির্ণয় করে তা থেকে বায়ুর দিক নির্ণয় করা সহজেই সম্ভবপর। বায়ুর উপরের দিকের চাপ বিমানকে উপরের দিকে নিয়ে যায় এবং তা থেকে বায়ুর উর্ধ্বচাপ এবং বিমান নীচে নামতে থাকলে তা থেকে বায়ুর নিম্নচাপ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিমানকে নদীর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া একটা কর্কের মত মনে করা যেতে পারে। আপনি জলের মধ্যেও এ ধরনের একটি কর্ক লক্ষ্য করে অনায়াসেই জলের গতি নির্ণয় করতে পারেন। এ ধরনের উপমা অনেকটা সত্য বটে—তবে এর মধ্যে মস্ত একটা বিসদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিমানে ইঞ্জিন রয়েছে এবং সেই ইঞ্জিনই বিমানকে চলন্ত বায়ুর উপর তুলে ধরে। এর জন্য এই পরিমাপটি সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। মনে করুন কোন উচ্চস্থান থেকে একটি বল স্থির বায়ুর মধ্যে দিয়ে ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে নীচে পড়ছে। আপনি যখন মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন তখন এটা আপনার কাছে ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে নীচে এসে পড়া উচিত। এখন মনে করুন আপনার সামনে একটা পাখা উপরে বাতাসের দিকে মুখ করে ছেড়ে দেওয়া আছে। পাখাটিকে আপনি ঠিক ঘণ্টায় ১০ মাইল উর্ধ্ব-গতিতে চালিয়ে দিন। এর পর কি হবে? নিশ্চিতভাবে বলটির নিম্নগতি ক্রমশঃ কমে যাবে, এবং অবশেষে বাতাসে কোন এক জায়গায় ঝুলতে থাকবে। বলটি বাতাসের মধ্যে দিয়ে ১০ মাইল বেগেই নীচে নামতে থাকবে, কিন্তু বাতাসও একই গতিতে উপরে উঠতে থাকবে। মাটি থেকে আপনার কাছে মনে হবে বলটি ঠিক একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আসুন আমরা এ বিষয়টি আর একটু অন্যভাবে বিবেচনা করে দেখি। মনে করুন একদিন আপনি জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন ঐ বলটা ঠিক এমনিভাবেই বাতাসে ঝুলছে। যেহেতু আপনি জানেন যে স্থির বায়ুতে

বলটা ১০ মাইল বেগে মাটিতে পড়ছে। আপনি একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে নীচে থেকে বাতাসও ১০ মাইল বেগে উপরে উঠছে।

যখন বিমান দিয়ে বায়ুর গতি নির্ণয় করা হয় তখন স্থির বায়ুতে বিমান কিভাবে চলবে এ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করার জন্য এই বিশেষ উদাহরণটি উল্লেখ করা হল। এর একটি বিকল্প পদ্ধতিও রয়েছে। বজ্রঝড়ের ব্যাপারে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বায়ুর ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যদি বিমানের মাথা ও লেজের দিকটা (সম্পূর্ণ দিগন্তের সমান্তরাল করে রাখা যায়—Horizantal) অনুভূমিকভাবে রাখলে বিমানের পাখাগুলো বিমানটিকে উপর-নীচের কোন দিকেই নিয়ে যেতে পারবে না। এ পদ্ধতিই এ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। বজ্রঝড়ের ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম বৈমানিককে বিমানটির সমতা রক্ষা করতে হবে। তারপর এর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত করে বিমানের আর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত করে বিমানের একটি নিরাপদ গতিও রক্ষা করতে হবে। এ সব করার পর বৈমানিক তখন বিমানের আর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হাত দিতে পারবেন না। এর পর নির্দেশানুযায়ী বিমান যদি উপরে যেতে চায় তা হলে তাকে উপরে যেতে দিতে হবে এবং অনুরূপভাবে যদি নীচে যেতে চায় তবে তাকে নীচেই যেতে দিতে হবে।

অবশ্য বৈমানিক বিমানটি কতদূর পর্যন্ত যেতে দিতে পারেন তার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সীমা থাকবে। যদি বিমানের পাখাটি হঠাৎ করে একটা বেশ বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করে তখন বৈমানিককে কতগুলো সংশোধনমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। বিমান যদি হঠাৎ করে কোন বৃক্ষ স্পর্শ করতে যায় তখন বৈমানিককে তা আবার নিরাপদ অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রের জন্য বৈমানিককে বিমানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হাত দেওয়া চলবে না।

সর্বন্যূন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের পরিকল্পনার সময় বৈমানিকের ঘরে একটি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। বৈমানিকদের কার্যাবলী সঠিক হয় কিনা তা দেখাই ছিল এর বিশেষ উদ্দেশ্য। বেশ কিছু সংখ্যক

'Flight'-এ বৈমানিকদেরকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হাত দিতে দেখা ছবিও পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের পরিকল্পনার সময় বৈমানিকরা তাদের বিমান কিভাবে চালাচ্ছেন তার বিবরণ লক্ষ্য করার জন্য আর একটি বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিমানের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে একটি রেকর্ডারের সঙ্গে সংযোজগ করে দেওয়া হয়। যখনই বৈমানিক তার জাল বা বিমান চালনার কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হাত দেবেন তখনই প্রতিটি কার্যের জন্য রেকর্ডারের একটি সূক্ষ্ম ফিল্মের ভিতর দাগ পড়ে যাবে। এর ফলে বৈমানিকেরা বিমানকে আপন মনে চলতে দেবার ব্যাপারে মোটামুটি সচেতন হয়ে যায়। অহিও পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সমস্ত বৈমানিকেরাই সত্যি সত্যি এ ধরনের ঝড়ে বিমান চালনায় পারদর্শী হয়ে পড়েন। অনেক সময় বিমান ঝড়ের মাঝে Turbulence-এর জন্য হঠাৎ করে ১০০০ থেকে ২০০০ ফুট পর্যন্ত নীচে নেমে যেত। বিজলীপাত এবং শিলা বৃষ্টিও এসব ক্ষেত্রে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বেতারে বৈমানিকদের মুখে বিমানবাহিনীর নানা ধরনের প্রচলিত গালি-গালাজও বেশী শোনা যেত। বোধ হয় এসব যুবকেরা ক্রমাগত এ ধরনের কাজে আবদ্ধ হয়ে অসাড় হয়ে পড়েছিল।—না আসলে তা মোটেই সত্য নয়। তাঁরা সত্যি তখন সবচেয়ে দুর্বিসহ আবহাওয়াতে বিমান চালনার কাজে পারদর্শীতার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই এ সত্যটি জানতেন এবং তার জন্য গর্ব বোধ করতেন।

কখনও বা তাঁরা বেশী ভড়কিয়ে যেতেন। একদিন এর একটি বিমান কালো এবং বিরাট আকার একটি বজ্রঝড়ের ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় উড়তে যেয়ে বিজলীর মধ্যে আটকা পড়ে যায়। বৈমানিকের জ্ঞান হলে তিনি দেখতে পান বিমানের গতি তখন ঘন্টায় ৩৫০ মাইল অথচ স্বাভাবিক গতি হল ১৮০ মাইল। কিছুক্ষণের জন্য সবার মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। বিমানটি কি মাথা নীচু করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে? কি কারণে বাতাসের গতি এত বৃদ্ধি পেতে পারে? এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম হল নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিমানটির মাথা উপরে ঘুরিয়ে উর্ধ্বগতি বৃদ্ধি করা। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মূল্য বুঝা গেল। স্বাভাবিক

নিয়ম রক্ষা করার পূর্বেই বৈমানিক অন্যান্য যন্ত্রের দিকে একটু নজর বুলিয়ে নিয়ে সেগুলোর পর্যবেক্ষণ বিশ্বাস করলেন না। সে সব যন্ত্রের হিসেব অনুযায়ী বৈমানিক ঠিক বেগেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি তখন বিমানটিকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সব কিছুই পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। এর পর সত্যি যখন তিনি পরিষ্কার আকাশে এসে পৌঁছলেন তখন দেখলেন তাঁর বিমানটি সোজা এবং সঠিক সমতায় চলছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর বিমানের গতি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি কাজ করছে না। কিন্তু কেন এটা হল ? এখন তিনি কিভাবে মাটিতে নামবেন ? আর একটি (P-61) পি-৬১ বিমানের একজন রাডার কণ্ট্রোলার পাঠিয়ে ঐ বিমানটিকে পরিচালনা করে আনা হল। ভুল নির্দেশক যন্ত্রওয়ালা বিমানটি তার সঙ্গির বেতার থেকে তার বিমানের গতিবেগ শুনে শুনে অনুসরণ করতে লাগলেন। এরা পরস্পর পাশাপাশি-ভাবে প্রায়ই এক সঙ্গে ভূমি স্পর্শ করলো। বিমান থামানোর কয়েক সেকেণ্ড পরেই এই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। বিজলী বিমানের 'PITOT' পিটট নলটিতে আঘাত করে। এ পিটট নলটি দিয়েই বিমানের গতিবেগ নির্ধারণ করা হয়। এটা বিজলীপাতের ফলে গলে যায়। প্রচণ্ড তাপের ফলে ফিউজ-ওয়ালা অংশটির মাঝে বেশ বড় রকমের একটি চাপের সৃষ্টি হয়। এই নলের চাপ বৃদ্ধির দ্বারা বিমানের গতি-নির্দেশক যন্ত্রে বিমানের গতি জানা যেত। বিজলীপাতের ফলে সে চাপ বৃদ্ধি পেয়ে যায় বলে এই নির্দেশক যন্ত্রে ৩৫০ মাইল গতিবেগ দেখা যাচ্ছিল। আর একটি নতুন নল আবার এই বিমানে লাগিয়ে দেওয়া হল। নতুন অভিসারের জন্য বৈমানিক ও বিমানটি আবার প্রস্তুত হয়ে গেল।

বিরাট রকমের ধাক্কা

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ৫ তারিখের ঝড়ে বিমান চালনা করা যে-কোন বিশেষ অভিজ্ঞ বৈমানিকের জন্যও ছিল বেশ কঠিন ব্যাপার। সব কিছুই ভাল ভাবে শুরু হল। পাঁচটি বিমান উঠবার জন্য প্রস্তুত হল এবং প্রায় ১২টা ৩০ মিনিটে এগুলো আকাশে উঠতেও শুরু করল। সবচেয়ে নীচের বিমানটিকে

৬০০০ ফুট উচ্চতায় ও সবচেয়ে উপরের বিমানটি ২৫,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠতে নির্দেশ দেওয়া হল।

প্রতিটি বিমানে ছিলেন একজন করে বৈমানিক, একজন করে রাডার পরিচালক এবং একজন করে আবহাওয়া পর্যবেক্ষক। বিমান উপরে উঠতে শুরু করার চাইতে সাথে সাথে বৈমানিকেরা রাডার কন্ট্রোল ঘরে বেতার যোগে নির্দেশ শুরু করলো। বিমান ঘাঁটির ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটি অন্ধকার ঘরে বিরাটকায় রাডার পর্দার সামনে বসে প্রধান কন্ট্রোলার সমস্ত বিমানকে নির্দেশ দিয়ে চলছিলেন।

প্রধান কন্ট্রোলারের সামনে রাডার পরিদর্শক যন্ত্র ছাড়াও আরও বেশ কিছু সাহায্যকারী ঐ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হত। এগুলোর একটির নামে ছিল স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা এবং তা দিয়ে প্রতি সময়েই বিমানের সমস্ত অবস্থার ছবি নেওয়া হত। এই পরিদর্শক যন্ত্রে বৃষ্টি ও মেঘস্তরগুলোকে কতকগুলো বড় রকমের উজ্জ্বল দাগের মত দেখা যেত। ঐ দাগগুলো ক্রমশঃই বড় ও উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে।

বিমান উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে পারলো। বিমানবাহিনীর পর্যবেক্ষকেরা উঁচুতে রাডারগুলোর চূড়ায় পরীক্ষার [illegible] শেষ করে ফেললেন। আবহাওয়া বৈজ্ঞানিকেরা ক্যামেরাগুলো পরিদর্শন করে রাডারে ক্রমবর্ধিত আবহাওয়ার প্রতিচ্ছবি দেখে ঝড়ের গতি নির্ণয় করলেন। [illegible] বৈমানিকদের একবার বেতারে কথা [illegible] করলেন। এবং সবাই তাদের নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে গেলেন, এবং এখন তারা [illegible] তিন মাইল পশ্চিমে [illegible] হলো। এক্ষুণি [illegible] কন্ট্রোলার আর নির্দেশ দিলেন।

'তিন পাঁচ তিন আপনি বাঁ দিকে ৩০° ডিগ্রী কোণ করে ঘুরে যান।'

'ঠিক আছে তিন পাঁচ তিন থেকে বলছি।' 'ছয় আপনি আপনার বর্তমান অবস্থানেই থাকুন।' 'ঠিক আছে, তিন পাঁচ ছয় থেকে বলছি।'

'তিন পাঁচ চার এখন আপনি ডান দিকে ৩৬° ডিগ্রী ঘুরে যান।'
'তাই করছি।'

এভাবে সমস্ত বিমানে নির্দেশ যেতে লাগল। রাডার পরিদর্শক যন্ত্রে আপনিও অনেকগুলো উজ্জ্বল ছোট ছোট বিন্দু দেখতে পেতেন। এসব বিন্দু নির্দেশ মত পরিচালিত। বিমানগুলো ছাড়া আর কিছুই না। মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যেই এসব বিমান সারিবদ্ধ হয়ে বজ্রঝড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করলো।

'আপনি আপনার বর্তমান অবস্থা ঠিক রাখুন এখন আপনি আপনার লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে গেছেন। এবার আপনার ক্যামেরা চালিয়ে দিন।'

আকাশে বৈমানিকেরা তাঁদের মাথার উপর চূড়োর মত মস্ত বড় বড় মেঘ দেখতে পেলেন। তাঁরা সবাই তাঁদের বন্ধনি বেঁধে নিলেন। প্রতিটি বিমানের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৮০ মাইলের মধ্যে রাখা হলো। বিমানগুলো সুসজ্জিত অবস্থায় সোজাসুজিভাবে সমতা রক্ষা করে চলতে থাকলো। এখন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করে স্বয়ংক্রীয় ভাবে চলার সময় এসে গেছে। ৩৫৪ নাম্বারের বিমানটি ১৫০০০ ফুট উপরে মেঘের প্রান্ত দিয়ে চলার সময় ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করলো। বরফের টুকরো এসে বিমানটিকে আঘাত করতে শুরু করে। পার্শ্বেই এক জায়গায় বিজলীপাত হল এবং বিমানের লেজে ও পাখায় বরফ জমতে শুরু হল। এর একটু পরে শুরু হল ঝাঁকুনি, প্রবল বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড টারবুলেন্স। হঠাৎ করে একটি উপর চাপ দেখা দিল। বিমানটি সঙ্গে সঙ্গে উপরে যেতে শুরু করলো। বৃষ্টি ও বরফের সংমিশ্রণে প্রবল ঝাপটা বিমানের জানালায় আঘাত করতে লাগলো। বিমানের উচ্চতা নির্ধারক যন্ত্রে যখন ১৬,৫০০ ফুট উচ্চতা দেখা গেল, ঠিক তখনই বিমানটি পরিষ্কার আকাশে এসে পৌঁছলো।

বৈমানিক জানালেন 'কন্ট্রোল তিন পাঁচ চার থেকে বলছি—আমি এখন পরিষ্কার আকাশে আছি।' তখন সময় হল বেলা ১টা বেজে ৩৪ মিনিট। ঝড়ের মাঝ দিয়ে যেতে মোট সময় লাগলো ৪ মিনিট পাঁচ সেকেণ্ড।

প্রায় একই সময়ে অন্যান্য বিমানও বেরিয়ে এল। সবাই বেশ কিছুটা বড় রকমের টারবুলেন্সের মাঝ দিয়ে ঝড় থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে তেমন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি।

একই পদ্ধতি বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুনরাবৃত্তি করা হল। প্রথম কয়েকবার উড়ার পর দু'টি ভাল বিমানে কিছুটা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় এবং এগুলো ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনা হয়। তখন তিনটি বিমান দিয়ে ৬,০০০, ১০,০০০ ও ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় বিমান পরিচালনা করা শুরু হয়। বিমানের মধ্যকার ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় নানা বিষয় স্বয়ংক্রীয়ভাবে রেকর্ড করে চলছিল।

ক্রমেই বিমান চালনা কিছুটা দুষ্কর হয়ে উঠছিলো এবং বৈমানিকদের জন্য ছিল মোটামুটি স্বাভাবিক ব্যাপার। হঠাৎ করে সপ্তমবারের সময় এটা আর স্বাভাবিক রইল না। কণ্ট্রোল ঘরের লাউডস্পীকারে হঠাৎ করে এক ভীত-সন্ত্রস্ত আওয়াজে সবাই ভীষণভাবে চমকে গেলেন।

কণ্ট্রোল আমি তিন পাঁচ চার নম্বর বিমান থেকে বলছি আমাকে এর ভিতর থেকে বের করে নিয়ে যান।

বৈমানিকের গলার আওয়াজ ভয়ে ভীষণভাবে কাঁপছিল।

'কণ্ট্রোল আমি আমার বিমান নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমি তিন পাঁচ চার নম্বর বিমান থেকে বলছি। আমি আমার বিমান নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না— আমায় এ থেকে বাইরে নিয়ে যান।'

'তিন পাঁচ চার—আমি কণ্ট্রোল থেকে বলছি আপনি ডান দিকে ২৭০° ডিগ্রিতে ঘুরে যান।'

'কণ্ট্রোল আমি তিন পাঁচ চার থেকে বলছি—আমি ঘুরতে পারছি না।' আমি এটা ঘুরাতে পারছি না।

তিন পাঁচ চার—ঠিক আছে আপনি আপনার বর্তমান অবস্থাতেই থাকুন। আপনি নিশ্চয়ই এগুলো ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারবেন।'

এর পর কয়েক সেকেণ্ড সময় নীরবে কেটে গেল। সবাই আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, 'ওখানে হচ্ছে কি ব্যাপারটা'? কিন্তু মুখে কেউ টু শব্দটি উচ্চারণ করছিল না। সবাই অপেক্ষা করছিল আর একটি সাড়ার জন্য। এর পর শব্দযন্ত্রে ভেসে এল একটা গম্ভীর স্বর। 'কণ্ট্রোল আমি তিন পাঁচ চার থেকে বলছি— তিন পাঁচ চার এখন কোথায়'?

‘তিন পাঁচ তিন থেকে বলছি, আপনি বাঁ দিকে ১৫০° ডিগ্রী ঘুরে যান’।

‘তিন পাঁচ ছয় আপনি ১৮০° ডিগ্রী ঘুরে যান।’ কণ্ট্রোলার এ ভাবে অন্য সমস্ত বিমান ঐ বিমানের পথ থেকে সরিয়ে দিলেন।

‘তিন পাঁচ চার আমি কণ্ট্রোল থেকে বলছি—আপনি শুনছেন কি?’ কোন উত্তর পাওয়া গেল না—আরও কিছু সময় বেরিয়ে গেল।

কণ্ট্রোল রুমের নীরবতায় শুধুমাত্র মাঝে মাঝে ক্যামেরার ক্লিক শব্দটি শোনা যাচ্ছিল। তখন দেখলে মনে হত যেন ঐ ঘরের সবার চোখ তখন রাডার পরিদর্শক যন্ত্রের মাঝে আঁঠা দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। সবাই দেখেছে ঐ বিমানের ছোট বিন্দুর ন্যায় প্রতিবিম্বটি বিরাট বজ্রঝড়ের মাঝে কোন্ পথে যাচ্ছে? এই বিন্দুটি যেন ইলেকট্রন প্রবাহের দ্বারা ফস্কার দিয়ে আবৃত কাঁচে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করছে। এ বিন্দুটির মাঝে একটি টিনের কৌটাতে রয়েছে তিনটি মানুষ আবদ্ধ এবং সেই কৌটাটি রয়েছে আবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

ক্লিক ক্লিক শব্দে ক্যামেরা ছবি তুলছে। বিজ্ঞান এখনও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

ঠিক যে-ভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল। তেমনি হঠাৎ করে সব শেষ হয়ে গেল।

‘কণ্ট্রোল তিন পাঁচ চার থেকে বলছি। আমি ভাল আছি এবং এখন ১০,০০০ ফুট উপরে আছি।’

কণ্ট্রোল ঘরে কেউ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লো না। এ যেন স্বস্তি বা আর্তনাদের নিশ্বাস—কতকটা যেন অভক্তি ও প্রার্থনার সংমিশ্রণ। সবই ভুলে গিয়েছিল যে কতটা গরম পড়েছে কিন্তু প্রত্যেকেই তখন ঘামে ভিজে উঠছিলো। কে দেখবে তা? এ সব তখন সত্যি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এর পর আর একটি ডাক এল, ‘কণ্ট্রোল তিন পাঁচ চার থেকে বলছি, একটি সংশোধনী—সে উচ্চতাটি হল বিশ হাজার ফুট।’

‘তিন পাঁচ চার—এবার বাড়ি ফিরে আসুন।’

উড্ডীয়নের পরবর্তী আলোচনা

প্রতিটি বিমান উড্ডয়নের পর বৈমানিকদের সঙ্গে বজ্রঝড় পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিকদের আলোচনা হত। প্রায়ই সবচেয়ে বেশী প্রশ্ন করতেন রস্কো, আর ব্রাহাম জুনিয়র, রিচার্ড-ডি কুন্‌স এবং ফ্রেড হোয়াইট। এঁরা চার জনই ছিলেন ডঃ বায়ারের প্রধান সহকারী। দিনের প্রতিটি উড্ডয়নের বিবরণী থেকে প্রতিটি বজ্রঝড়ের মাঝে বিমান চালনার বিষয়গুলো খুঁটিনাটিভাবে আলোচনা করা হত। এগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ দেরী হলে পরে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় মনে না-ও বা থাকতে পারে।

মহাশূন্যচারীদের বেলাতেও উড্ডয়নের পরবর্তীকালীন বিবরণী ঠিক এমনি ভাবে শোনা হয়। মহাশূন্যযান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এঁদেরকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। একদল বৈজ্ঞানিক এঁরা কি দেখেছেন, কি অনুভব করেছেন, কি ধরনের গন্ধ পেয়েছেন, কেমন ধরনের শব্দ শুনেছেন এরূপ নানাবিধ প্রশ্ন একের পর এক জিজ্ঞাসা করে চলেন। কখনও নানা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তার মধ্যে থেকে হয়তো বা বড় ধরনের একটা ধারণা বা সত্যের উৎস বেরিয়ে পড়তে পারে। ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্টের সেই বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের দিনটি ঠিক পূর্বে বা পরের ঐ ধরনের অন্যান্য দিনের মত ছিল না। সেদিন একটা বিমান হয়তো বা আর না-ও ফিরে আস্‌তে পারত। সেইটেই ছিল সবার মনে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। ব্রাহাম, কুন্‌স এবং হোয়াইটও সেদিন অন্য সবার মত ৩৫৪ নং বিমানের সেই শক্তিশালী ঝাঁকুনির তথ্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণীর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাই বলে অন্যান্য বিমানের সে ঝড়ের মাঝে—প্রবেশের বিবরণীগুলো কম প্রয়োজনীয় তথ্য নয়। তাঁরা প্রথম থেকে সবগুলো বিবরণী সংগ্রহ করলেন।

প্রথমবার বিমান চালনার সময় কি হল ? সে সময়কার টারবুলেন্স কতটা তীব্র ছিল ? মেঘের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত যায়গা জুড়ে টারবুলেন্স কি একই রকম ছিল ? মেঘের দু ধারের মেঘবিহীন আকাশে কোন টারবুলেন্স ছিল কি ? মেঘের মাঝে বিমানের কতটুকু উচ্চতা বেড়েছিল বা কমে ছিল ? কোন রকমের বৃষ্টি বা তুষারপাত ছিল কি ? কোন রকম শিলাপাত ছিল কি ?

শিলাগুলো কত বড় ছিল ? কোন রকমের Icing ছিল কি ? থাকলে তা কত পুরু ছিল ? এভাবে একের পর এক প্রশ্ন চলতে থাকে।

এটা সত্য যে ফিল্‌ম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিবরণী থেকে বিশ্লেষণ করে এগুলো বহু প্রশ্নের জবাব বেশ সহজেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তবুও এসব কথা দুবার জানা গেলে তুলনামূলক তথ্য-বিচার সহজেই সম্ভবপর হয়। এ ছাড়া খুব খারাপ আবহাওয়ার সময় বৈমানিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ধরনের হয় সে সম্পর্কেও এ থেকে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হওয়াও ছিল এগবেষণার আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে টারবুলেন্সের মধ্যে বিমান চালনার ঝুঁকি নেবার বিচার বুদ্ধি বেশ কিছুটা পরিবর্তনশীল।

এ সময়ে বৈমানিকের শারীরিক বা মানসিক অনুভূতি তার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোর উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যন্ত্র দ্বারা শুধু টারবুলেন্সই মাপা যায় কিন্তু এসব বিবরণ থেকে বৈজ্ঞানিকের মানসিক প্রতিক্রিয়া বৈমানিক সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণার উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। অবশেষে ৩৫৪ নং বিমানের বৈমানিকের পালা এল। সেদিনের সেই বিশেষ বিমানটির ঐ পরিক্রমণের কথা আমরা কখনও ভুলতে পারব না।

ঠিক শেষের পরিক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সব ঘটনাই প্রায় অন্য দিনের মত স্বাভাবিক ছিল। প্রতিটি পরিক্রমণের সময়ই মাঝে মাঝে বেশ মারাত্মক রকমের টারবুলেন্স ছিল এবং এতে করে বিমানটি কখনও বা ২০০০ ফুট উঁচুতে এবং কখনও বা ২০০০ ফুট নীচে উঠা-নামা করছিল। যখন বৈমানিক শেষ মেঘটির মাঝে প্রবেশ করছিলেন তখন তা অন্যান্য পরিকমণের চেয়ে আলাদা ধরনের কিছু হবে বলে তিনি কোন লক্ষণ অনুভব করেন নি।

হঠাৎ করে এ সময় যখন বিমানটি বেশ মারাত্মক ধরনের টারবুলেন্সের সম্মুখীন হল বৈমানিকের কাছে তখন মনে হল যেন তার বিমানটি একটা বড় ধরনের ইঁটের দেয়ালে আঘাত করেছে। বিমানটি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। বিমান উপর-নীচ করার কাঠি ঘুরিয়ে বা বিমানের হাল ঠেলেও কোনই ফল পাওয়া গেল না। তখন সমস্ত মেঘ জুড়ে রয়েছে প্রবল বৃষ্টি ও তুষারপাত। শেষ ৪০ সেকেণ্ডে বড় ধরনের শিলা ঝড়ও দেখেছেন বৈমানিক।

বিজলীপাতের সংখ্যা ছিল অগণিত। দৃষ্টি গোচরতার পরিমাপ দাঁড়িয়েছিল তখন কয়েক ইঞ্চিতে মাত্র। ঝড়ো বাতাস বিমানটিকে কখনওবা উপরে কখনও-বা নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, এবং বৈমানিক কখন কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। যান্ত্রিক তালিকা থেকে জানা যায় যে বাতাস উপরে উঠছিলো। বিমানটি মাত্র ১ মিনিট সময়ের মধ্যে ১৫,০০০ ফুট থেকে ২০,০০০ ফুট উপরে উঠে যায়।

কণ্ট্রোল রুম থেকে সবাই মনে করেছিলেন যে বিমানটির এ পরিক্রমণের সময় ছিল বেশ কিছুটা সময় জুড়ে। ঘড়ির কাঁটা কিন্তু অন্য রকমের কথা বলে। বৈমানিকের মেঘে প্রবেশ করে সাহায্য চাইবার সময় থেকে শুরু করে পরিষ্কার আকাশে প্রবেশ করার সংবাদ দেবার সময়ের পার্থক্য মাত্র এক মিনিট সময়কাল। বিমানের উচ্চতা মাপার যন্ত্রের সাহায্যে এরপর পরীক্ষা করে জানা যায় যে বিমানটি মাত্র ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং আকস্মিকভাবে বিমানটি এর পর ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে শুরু করে এবং মাত্র এক মিনিট সময়ের মধ্যে ২০,০০০ ফুট উপরে উঠে যায়। এর অর্থ হল এই যে ঐ সময়ে প্রতি মিনিটে ৫,০০০ ফুট অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫৭ মাইল বেগে বিমানটি উপরে উঠেছিল। ঝড়ের মধ্যে এটা বায়ুর বেশ বড় রকমের একটা উর্ধ্বগতি এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

এই বিশেষ উড্ডয়নের সময় একটা বেশ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বিমান একই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে। ১৫,০০০ ফুট উপর দিয়ে যে বিমানটি উড়ছিল সেখানে বৈমানিক সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের টারবুলেন্সের সম্মুখীন হন। অন্য দুটো বিমান একই মেঘের মধ্যে যথাক্রমে ৫,০০০ ফুট ও ১০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়বার সময় কোন রকমের বড় ধরনের টারবুলেন্সের সম্মুখীন হয় নি। সত্যি বলতে কি ১০,০০০ ফুট উপরের বিমানটি থেকে বায়ুর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতিও পরিলক্ষিত হয় নি। কেন? এই প্রশ্নটিই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। উর্ধ্বগতি কি ঝড়ের ছোট্ট একটা স্তরের মধ্যে বিরাজ করছিল? যার ফলে অন্যান্য বিমান চালক নীচে দিয়ে উড়বার সময় এটা মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। পরিচালক বিমানগুলোকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পরিচালনা করছিলেন সত্য তবুও

যে-কোন বিমান হঠাৎ করে ১,০০০ ফুট এদিক ওদিকেও চলে যেতে পারত। এ ব্যাপারটি আর এক ভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বায়ুর এধরনের ঊর্ধ্বচাপ একটি লম্বা স্তর না হয়ে মেঘের মধ্যে বাতাসের বড় বড় বুঁদবুঁদের ঊর্ধ্বগতিও হতে পারে। হয়তো বা ৩৫৪ নং বিমানটি এধরনের একটা বড় বুঁদবুঁদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। অন্য বিমানগুলো অপেক্ষাকৃত ধীরে প্রবাহমান বাতাস দিয়ে যাওয়ার ফলে হয়তো বা তেমন কোন কিছু বিপদের সম্মুখীন হয় নি।

বজ্রঝড় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঝড়ের মধ্যে বায়ুর গতি সম্পর্কে গবেষণা করা। এ গবেষণার মাধ্যমে এ সম্পর্কে বেশ কিছুটা তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কতকগুলো প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে এর মাধ্যমে। কতগুলো প্রশ্নের আবার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত মোটেই পাওয়া যায় নি। এছাড়া কিছু প্রশ্নের কোন সমাধান না পেয়ে বরং আরও নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে।

গত পনের বছর ধরে আবহাওয়াবিদগণ বজ্রঝড় সম্পর্কে কাজ করে চলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বজ্রঝড় সম্পর্কে সবকিছু জানা হয়ে গেছে বললে ভুল হবে। এ গ্রন্থের প্রথমেই জানতে হবে যে বজ্রঝড় সম্পর্কে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা আজও শেষ হয়ে যায় নি। আমাদের জ্ঞানের শূন্যতাগুলো সম্পর্কে এ বইটির নানা অধ্যায়ে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এসব সমস্যার সমাধান বের করার জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বজ্রঝড় কেন হয় ?

বজ্রঝড় কি প্রয়োজনীয় ?

উত্তরে আপনি হয়তো বলবেন—এর উত্তর নির্ভর করে প্রশ্নকর্তা কে এবং তাঁর পেশা কি তার উপরে। গভীর রাতে বজ্রের শব্দে ছোট বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে—ঘণ্টাখানেক ধরে চিৎকার শুরু করলে এ ব্যাপারে মা-র মনের প্রতিক্রিয়াটা সহজেই অনুমেয়। বৈমানিক বিমান নিয়ে ঝড়ের মাঝে প্রবেশ করলে তার চিন্তা ধারাটিও ঐ মায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যেতে পারে। সারা ক্ষেতের গমের চারাগুলো শিলাপাতের ফলে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে চাষী আবহাওয়া দেবতাকে অভিসম্পাত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না। আবার আর এক দিন ঐ চাষীই তার চষা ক্ষেতে ঝড়ের ফলে বারি বর্ষণে সিঞ্চিত ভেজা মাটিগুলো দেখে হয়তো বা অনাবিল আনন্দে অধীর হয়ে পড়বেন।

এ ধরনের সবগুলো মানবিক প্রতিক্রিয়া সহজেই আমাদের বোধগম্য হয় সত্য, কিন্তু তা থেকে আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি পাওয়া সম্ভবপর নয়।

বজ্রঝড় প্রয়োজনীয় কেন এ কথা জানতে হলে প্রথমে বজ্রঝড় কেন হয় সে প্রশ্নটির একটা সঠিক উত্তর জেনে নিতে হবে। সম্ভবতঃ আমাদের ধারণার বাইরে বা আমাদের জ্ঞানের অগোচরে বজ্রঝড় সব দিক দিয়েই আমাদের শুধু ক্ষতিই করে থাকে।

সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ুর তালিকা থেকে হিসেব করে ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডের সি. ই. শি. ব্রুকস একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে প্রতি মুহূর্তে গড়ে ১৮০০-টি বজ্রঝড় সারা পৃথিবীতে বিরাজ করে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে ব্রুকের এ সংখ্যার ন্যূনপক্ষে দুই তিন গুণ বজ্রঝড় সব সময় পৃথিবীতে বিরাজমান রয়েছে। এ মুহূর্তে শুধুমাত্র ব্রুকসের এই সংখ্যাটিকেই আমরা মেনে নিচ্ছি। এটা বেশ বড় রকমের সংখ্যা বলে মনে হতে পারে। এ সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে পৃথিবীর ৩০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে শুরু করে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বজ্রঝড় খুবই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি বিচ্ছিন্ন ঝড় মাত্র এক

ঘণ্টা বা তার একটু বেশী সময় ধরে বিরাজ করে। এ থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে প্রতি মুহূর্তে ১৮০০-টি ঝড় থাকতে হলে লোপ পেয়ে যাওয়া ঝড়গুলোর স্থলে আবার নতুন নতুন ঝড়ও তেমনিভাবে তৈরী হতে হবে। সৃষ্টি ও বিলোপের মাঝে বজ্রঝড়কে বেশ কতগুলো প্রয়োজনীয় কাজও করে যেতে হয়। বজ্রঝড় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের শক্তিকে উচ্চতর স্তরে স্থানান্তরিত করে থাকে। এ ছাড়াও বড় ঝড় বৈদ্যুতিক শক্তি (change) স্থানান্তরের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এখন পরীক্ষা করে দেখা যাক্ যে কেন এবং কি ভাবে বজ্রঝড় অধিক শক্তি পরিবেষ্টিত স্থান থেকে তার চেয়ে ন্যূন শক্তি পরিবেষ্টিত স্থানে শক্তি স্থানান্তরিত করে থাকে।

বজ্রঝড়ের স্থানান্তর শক্তি

গ্রীষ্মকালের বিশেষ কোন দিনে সূর্যের তাপ বিকিরণের মাধ্যমে মাটি ও বায়ুমণ্ডলের নিম্ন অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন স্তরে যথেষ্ট তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মাটি ও জলীয় বায়ুতে সূর্যের শক্তি যত শোষিত হয় তাপমাত্রাও সেই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে জলীয় বাষ্প ও পৃথিবীর উপরি-ভাগ থেকে অধিক মাত্রায় তাপ বিকিরণ শুরু হয়। কিন্তু পৃথিবী থেকে—মহাশূন্যের দিকে বিকিরিত তাপের মাত্রা সূর্য থেকে বিকিরিত তাপের চেয়ে বহুগুণে কম হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তর সূর্য বা বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরের বিকিরণে খুব অল্প তাপই শোষণ করতে পারে। এর ফলে বায়ুর নিম্ন মণ্ডলে তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে, কিন্তু ঊর্ধ্বমণ্ডলে তাপের পরিবর্তন হয় খুবই কম। শুধুমাত্র বিকিরণই যদি তাপ সঞ্চারের একমাত্র মাধ্যম হত তবে পৃথিবীর কতগুলো অঞ্চলে কোন জীবনের সম্ভাবনাই থাকতো না। গ্রীষ্মকালে তা হলে দিনের তাপমাত্রা কতগুলো যায়গায় এমনভাবে বৃদ্ধি পেত যার ফলে যেসব এলাকার প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। সৌভাগ্যবশতঃ আরও কতগুলো পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চারিত হয়। সর্ব প্রথম আণবিক পরিবহন পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নাম থেকে বোঝা যায় যে এ পদ্ধতিতে

তাপ অণুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। কোন আয়তনের উষ্ণ বাতাসে অণুর চারিদিকের গতি সমপরিমাণ আয়তনের ঠাণ্ডা বাতাসের তুলনায় দেড়গুণ বেশী। সত্যি বলতে কি পদার্থবিদরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাষ্পের যে কোন তাপমাত্রা অণুর গতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বায়ুতে অণু যত দ্রুত-গামী হয় বায়ুর তাপও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—গতি শ্লথ হলে তাপ কমে যায়।

এখন যদি কিছু গরম ও কিছু ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ করে পাশাপাশি রাখা যায় তা হলে গরম বাতাসের অণুগুলো সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা বাতাসের অণুগুলোর উপর আঘাত হান্‌তে শুরু করবে। এরপর দ্রুতগামী ও ধীরগামী বায়ুর অণুগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিশে একটি অণু অন্যটিকে আঘাত হান্‌তে শুরু করবে। সময়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা বায়ুর অণুর গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ বায়ুর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দু রকমের বায়ুর তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে। আণবিক পরিবহনের ফলে এ ক্ষেত্রে উষ্ণ বাতাস থেকে ঠাণ্ডা বাতাসে তাপ চলাচল প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

নিম্ন মণ্ডলের বায়ুর তাপ উচ্চমণ্ডলের বায়ুর তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেই আণবিক পরিবহন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে তাপ উপরের দিকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। এ প্রতিক্রিয়াটি খুবই ধীরে কাজ করে। পৃথিবীর বহির্গামী বিকিরণ ও আণবিক পরিবহনের মাধ্যমে যে তাপ বায়ুর ঊর্ধ্বমণ্ডলে সঞ্চারিত হয় তার সব তাপ মিলেও সূর্যের স্থির বিকিরিত তাপের পরিপূরক হয় না। বায়ুর তাপমাত্রা খুব বেশী যাতে না হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য তাপের আর একটি স্থানান্তর শক্তির প্রয়োজন। এই বিশেষ তাপ স্থানান্তর শক্তির নাম হল পরিচলন।

আবহাওয়াবিদ যখন 'পরিচলন' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তার দ্বারা সাধারণতঃ জলীয় পদার্থের (Fluid) স্থানান্তর এবং জলীয় পদার্থের গুণাবলীর সংমিশ্রণই বুঝিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ এসব গতি হয় ঊর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী। পরিচলন স্রোত দ্বারাই বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের তাপ উচ্চতর স্তরে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

বহু পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালের দিকে বৈজ্ঞানিকরা জলীয় পদার্থের পরিবহনের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেতেন। একটি পাত্রে

স্বল্প পরিমাণ জল ঢেলে পাত্রটির নিম্নভাগ উত্তপ্ত করে তখনকার দিনে এ সমস্যাটি সম্পর্কে গবেষণা করা হত। ছোট ছোট জিনিসগুলো জলীয় পদার্থের মধ্যে রেখে দেয়ার ফলে সেগুলোর গতি সহজেই দেখা যেত। যখন সবেমাত্র তাপ দেয়া হত দর্শক তখন কোন গতিই দেখতে পেতেন না। জলীয় পদার্থের নিম্নভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলীয় পদার্থের উপরি-ভাগে বেশ পরিষ্কারভাবে পরিচলনের ছাঁচে ধরা পড়তো। এর ফলে অধিকস্থান জুড়ে নিম্নগামী জলীয় পদার্থের মাঝে প্রায় সমপরিমাণ স্থান জুড়ে তখন ঊর্ধ্বগামী জলীয় পদার্থ পরিবেষ্টিত হতে দেখা যেত। এসব পরীক্ষণের ব্যাখ্যা এখন বেশ সহজেই করা যেতে পারে। কোন Fluid-এর নীচের তাপমাত্রা উপরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী হলে আণবিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ উপরের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। খালি চোখে এসব কিছুই দেখা যায় না। তাপের তারতম্য যখন একটি বিশেষ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই পরিচলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে কোথাও বা জলীয় বাষ্প উপরে উঠতে থাকে এবং কোথাও বা নীচে নামতে শুরু করে। এর জন্য গণিতের সমীকরণ বের করা হয়েছে এবং কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে তা থেকে এসব প্রক্রিয়া বেশ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যে অবস্থায় পরিচলন শুরু হয় তা শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়। 'জলীয় বায়ুর' গুণাবলী এবং যে পাত্রে জলীয় বায়ু আছে তার গঠন পরিচলনের বিশেষ অবস্থাগুলোর উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের জন্য জলীয় বায়ুর পরিচলনের ফলাফল বিশেষ প্রয়োজনীয়। বায়ুমণ্ডলের নানা ধরনের চলনশীলতা সম্পর্কীয় সমস্যাগুলোর জন্য বায়ুকে একটি 'Fluid' বলে পরিগণিত করা যেতে পারে। বহুক্ষেত্রেই বায়ুর স্রোতে ও জলস্রোতের গতির সমীকরণ সমাধান করার জন্য জলীয় বায়ু ও বাষ্পের প্রাকৃতিক গুণাবলীর পার্থক্যগুলো ধরে নিতে হয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নমণ্ডলের এক ঘন ইঞ্চি বায়ু এক ঘন ইঞ্চি জলের তুলনায় ১০০০ গুণ ছোট।

গাণিতিক ও পরীক্ষাগারের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে পরিচলনের কাজ শুরু হয়। বায়ু উপরে উঠতে থাকলে তাপও উপরে স্থানান্তরিত হয় এবং এতে

করে তাপের তারতম্য কমতে থাকে। পরিচলন স্রোত দুর্বল হয়ে পড়লে এসব বায়ু বেশী উপরে উঠতে পারে না। অন্যান্য সময়ে এগুলো বায়ুমণ্ডলের খুব উপরে উঠে যায় এবং এক রকমের সাদা তুলোর মত মেঘের সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মকালে এ ধরনের মেঘ প্রায়ই দেখা যায়। অনেক সময় পরিচলন স্রোত খুবই শক্তিশালী হয়ে পড়ে এবং তখন নিম্নস্তরের বায়ু দশ মাইল ঊর্ধ্বেও উত্থিত হতে পারে। এ রকম হলেই আমরা বজ্রঝড় পেয়ে থাকি। বজ্রঝড়কে পরিচলন মেঘের একটা বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিচলনের গভীরতা বায়ুমণ্ডলের তাপের নানা ধরনের বিস্তৃতির উপর বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে বায়ুর তাপ নীচের দিকে সবচেয়ে বেশী এবং উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তাপ কমতে থাকে। উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা তাড়াতাড়ি কমতে থাকলে পরিচলন প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এর জন্য উচ্চতার সঙ্গে তাপ হ্রাসের পরিমাণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের 'স্থিতিশীলতা' মাপা হয়ে থাকে। উচ্চতার সঙ্গে বায়ুর তাপ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হলে বায়ুমণ্ডলকে 'স্থিতিহীন' বলা হয়। এ সময়ে পরিচলন প্রক্রিয়া বেড়ে যায় এবং ফলে বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা যাতে খুব বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য স্থানান্তরের একটি সুষ্ঠু মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকৃতি পরিচলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে ব্যবস্থাটির একটা সুন্দর সমাধান করে দিয়েছে। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর বেশী উত্তপ্ত হলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপগুলো পরিচলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়া চলার পর বায়ুমণ্ডল স্থিতিশীল হয়ে পড়লে একটি চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বজ্রঝড় সে অবস্থায় নেপথ্যে শক্তি সঞ্চার করে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়।

পরিচলন—জলীয় বাষ্প ও শক্তি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা নিম্নস্তর থেকে তাপ বায়ুর গতির মাধ্যমে কিভাবে উপরের স্তরে স্থানান্তরিত হয় সে পদ্ধতিটি সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। পূর্বের তাপকে একটি শক্তি হিসেবে ধরে নিয়ে একটি গরম জিনিস থেকে তুলনামূলক

ভাবে আর একটি ঠাণ্ডা জিনিসে তাপের স্থানান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদি হঠাৎ করে একটি জ্বলন্ত ছুরিতে আপনার হাত পড়ে তখনই আপনার হাতে তাপ সঞ্চারিত হয় এবং ফলে আপনার হাত গরম হয়ে পড়ে। আবার যখন আপনি হাত দিয়ে একটি বরফের টুকরো ধরেন তখন আপনার শরীর থেকে তাপ বরফের টুকরোটির মাঝে সঞ্চার হয়। ফলে আপনার হাত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এ ধরনের তাপ স্থানান্তর প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারেন। বায়ুমণ্ডলে এ ধরনের তাপ স্থানান্তর পদ্ধতি একটা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এ ছাড়াও আর একটি তাপ স্থানান্তরের পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিটি অল্প লোকেই জানেন; কিন্তু তা বলে এর গুরুত্ব মোটেই কম নয়।

গ্রীষ্মকালে আপনি যখন 'Swiming Pool' থেকে বেরিয়ে আসেন তখন আপনার অবস্থা কি হয় এবার সে বিষয়টির একটু কল্পনা করে দেখা যাক। বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি তখন খুবই কম হয় তবে জল থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটু শীত শীত ভাব উপলব্ধি করবেন। এ সময়ে বাইরে ১০০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা হলেও এমনি মনে হবে। এ সময়ে বায়ুর তাপমাত্রা যদি ১০০° ফারেনহাইট হয় এবং আপনার শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৮'৬° ফারেন হাইট হত তা হলে গরম বায়ু থেকে আপনার ঠাণ্ডা শরীরে তাপ স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত ছিল। এর ফলে আপনার শরীর গরম হওয়া উচিত। যা হোক তখন আর একটি তাপ স্থানান্তর প্রক্রিয়া পূর্ব প্রক্রিয়াটির চেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে পড়ে। আপনারা অনেকেই হয়তোবা জানেন যে বাষ্পীবন পদ্ধতির যোগাযোগের জন্যই এটা সম্ভবপর হয়। আপনার কাছে যদি খুব বেশী শক্তিশালী কোন 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্যাস' থাকতো তাহলে দেখ্‌তে পেতেন যে জলীয় বায়ু বাতাসে মিশে যাচ্ছে বলে আপনার শরীর ক্রমশঃ শুক হয়ে পড়ে। এ কাজটি চলার জন্য বাইরে থেকে দেয়া শক্তির প্রয়োজন, যাতে করে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হতে পারে এবং খুব শীঘ্রই জলীয় পদার্থ থেকে বাষ্পীভবন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। জলের তাপ শক্তি এবং আপনার চর্মের তাপশক্তি দ্বারাই এ প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়ে থাকে। বাষ্পীভবন যত দ্রুত চলতে থাকে তাপও তত দ্রুত বাইরে বের হয়ে থাকে। তার ফলে আপনার শরীর ও তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

অবশ্য যখন সমস্ত জল উড়ে যায় তখন তাপের পরিচলন শক্তি সবচেয়ে বেশী প্রবল হয়ে পড়ে এবং তার জন্য আপনার শরীর তাড়াতাড়ি গরম হয়। এ সময় ইচ্ছা করলে আপনি আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

দেখা গেছে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করতে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। বায়ুর তাপমাত্রা যখন 0° ডিগ্রি সেঃ অর্থাৎ (৩২° ফাঃ হাঃ) তখন আপনি ৫৯৭ ক্যালরি তাপ প্রয়োগ করে ১ গ্লাস জলকে জলীয়বাষ্পে পরিণত করতে সক্ষম হবেন। যখন জলীয় বাষ্পের উল্‌টো প্রক্রিয়া অর্থাৎ ঘণীভবন শুরু হয় তখন তাপকে বাইরে বের করে দিতে হয়। যদি আপনার কাছে এক গ্লাস বরফ গোলা জল থাকে এবং তার মধ্যে যদি ঘণীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে তবে প্রতি গ্লাস জলকে বরফে পরিণত করতে একইভাবে ৫৯৭ ক্যালরি তাপ গ্লাস থেকে বের করে দিতে হবে। এ তাপই বরফ গলতে সহায়তা করবে।

জলীয় বাষ্প বা ঘণীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে তাপ বেরিয়ে আসে তাকে সুপ্ত তাপ বলা হয়। আপনারা সবাই বুঝেন যে সুপ্ত কথার অর্থ বলতে কোন বিশেষ কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে অথচ তা প্রকাশিত হয়নি এ কথাই বুঝা যায় মাত্র। এ থেকে সুপ্ত তাপ কথাটির অর্থও সহজেই অনুমান করা যায়। কোন একটি পাত্রে যদি কিছু পরিমাণ বায়ু থাকে এবং বায়ুর মধ্যকার জলীয় বাষ্পে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয় তা হলে বায়ুর তাপমাত্রা বাষ্পীভবনের জন্য ক্রমশঃ কমতে শুরু করবে। অন্যদিকে এ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের মধ্যে ঘণীভবন প্রক্রিয়া শুরু হলে সুপ্ত তাপ বাইরে বের হবে এবং ফলে বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সুপ্ত তাপের ভূমিকার জন্য হয়তো বা একটু বেশী করেই বলা হল। বজ্রঝড় বিশ্লেষণের ব্যাপারে এ প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে বলে এ সম্পর্কে একটু বেশীই আলোচনা করা হল।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে পরিবহন প্রক্রিয়ার দ্বারা উপরের দিকে তাপ সঞ্চারণ করা সম্ভবপর হয়। এখন এটাও বোঝা যেতে পারে যে বজ্রঝড় থেকে বেশ বড় রকমের সুপ্ত তাপও পরিবর্তিত হয় এবং তা নিম্নরূপে হয়ে থাকে। যখন কিছুটা উষ্ণবায়ু উপরে উঠা শুরু করে এবং ক্রমশঃ বেশ উপরে উঠে যায় অর্থাৎ যেখানে বায়ুর চাপ খুব কম সেখানে বায়ুটি ক্রমশঃ আয়তনে বাড়তে

শুরু করে। বায়ুর এ ধরনের আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। বায়ু থেকে এ শক্তি এসে থাকে এবং তার ফলে বায়ু ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকে। এর জন্য বায়ুর তাপমাত্রা কমে যায়। বায়ুমণ্ডলের প্রতি ১০০০ ফুট উচ্চতার জন্য বাতাসের তাপমাত্রা ৫·৫° ফাঃ হাঃ কমে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশী মাত্রায় কমতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বে উল্লিখিত বায়ু কোন বিশেষ উচ্চতায় তার চারদিকের বায়ুর চেয়ে উষ্ণই থাকবে। এ ক্ষেত্রে এ বায়ুটি তখনও হাল্কাই থাকবে এবং ফলে আরও উপরে উঠবে।

এ বায়ু থেকে তাপমাত্রা কমে গেলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে যাবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা যখন শতকরা একশ ভাগ হয়ে যায় তখন ঘণীভবন শুরু হয়। এ সময়ে বিন্দু আকারে মেঘ দেখা দিতে থাকে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে এর ফলে বায়ু থেকে ঘণীভবনের সুপ্ত তাপ বের হতে শুরু করে। যখন তা শুরু হয় তখন ঊর্ধ্বগামী বায়ুর তাপ প্রতি ১০০০ ফুটে ৩·৩° ফাঃ করে কমতে থাকে। বায়ু আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ ঠাণ্ডা হয়ে পরে এ সুপ্ত তাপ তার কিছু অংশ বৃদ্ধি করে থাকে।

যদি শুধু মাত্র কিছু সংখ্যক ছোট বিন্দু কণা নিয়ে কিছু ছোট মেঘের সৃষ্টি হয় তবে বেশী সুপ্ত তাপ বাইরে বের হতে পারে না। যখন জল কণাগুলোর মাঝে বাষ্পীভবন শুরু হয় তখন কিন্তু একই বায়ু যেখানে পূর্বে তাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল সেখান থেকেই আবার তাপ বের করে নিতে শুরু করে। ভারি ধরনের বৃষ্টি অর্থাৎ বজ্রঝড় তৈরির সময় ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম হয়ে যায়।

ঊর্ধ্বগামী বায়ুর পঙতি যখন উপর থেকে আরও উপরের স্তরে যাওয়া শুরু করে তখন ঘণীভূত জল একটির সঙ্গে আর একটির সংমিশ্রণে বড় আকারের বরফ ও জলবিন্দুর সূচনা করে। এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ব্যাস যখন কয়েক হাজার মাইক্রনের * চেয়েও বেশী হয়ে পরে তখন এগুলো ঊর্ধ্বগামী বায়ুর মাঝ দিয়ে আবার নীচে পড়তে শুরু করে। নীচে পড়া শুরু হলে এদের

---

* টিকা—এক মাইক্রন অর্থ হল এক মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ০·০০০০৩৯ ইঞ্চি। মেঘের বিন্দুকণার ব্যাস সাধারণত ২০ মাইক্রন। বারি বিন্দুর বেলায় এ ব্যাসের পরিমাণ হয় প্রায় ২০ মাইক্রন।

আয়তনও বাড়তে থাকে এবং এগুলো থেকে কখনও বা বৃষ্টি এবং কখনও বা শিলাপাত হতে পারে। এভাবে প্রারম্ভিক বায়ুগুলো ঘণীভবন প্রক্রিয়ার দ্বারা উষ্ণ হয়ে বায়ুমণ্ডলের বেশ কিছুটা উঁচু স্তরে উঠে, পরে ঘণীভবনের ফলে আবার নীচে নামতে শুরু করে। বাষ্পীভবন শুরু হলে এ সব বায়ু চারিদিকের বায়ুমণ্ডল থেকে আবার নতুন করে তাপ সংগ্রহ করা শুরু করে। এভাবে তাপ বায়ুর নিম্নমণ্ডল থেকে উচ্চমণ্ডলে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে দেখা যায় যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের বায়ু শীতল এবং নিম্নস্তরের বায়ু উষ্ণ।

কখনও বা জলবিন্দু ও বরফ যে আয়তনের বায়ু থেকে ঘণীভূত হয়েছে তার চেয়েও বড় আয়তন বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় এ সব বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়েও মাটিতে পড়তে পারে না। এর ফলে বায়ুর তাপ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

বজ্রঝড়ের প্রারম্ভে উপরের ঠাণ্ডা বায়ু নীচে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় এগুলোকে তার পারিপার্শ্বিক বায়ুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বলে মনে হয়ে থাকে। বায়ুর নিম্নগামী গতির মাঝে জলবিন্দুর বাষ্পীভবনের জন্য এটা সম্ভবপর হয়। এই বিশ্লেষণ গতিকে 'Down draft' বা নিম্নপ্রবাহ বলা যেতে পারে। নিম্ন প্রবাহের ফলে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে কখনও বা সূর্য উত্তপ্ত বাতাস সরে গিয়ে বায়ুর তাপমাত্রা ১০^{0} কাঃ থেকে ২০^{0} ফাঃ পর্যন্ত কমেও যেতে পারে। ঝড়ের এ সমস্ত বিষয় পরে আমরা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করবো।

এ মুহূর্তে আমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে পরিচলন মেঘ ও বজ্রঝড়ের মাধ্যমে তাপ বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে স্থানান্তরিত করা যায়। আবহাওয়াবিদগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরের তাপ স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার জন্য এ পদ্ধতিটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও বায়ুমণ্ডলের সুনির্দিষ্ট বায়ু প্রবাহও এই প্রক্রিয়াটির প্রকৃত ভারসাম্য রক্ষা করে। এ ব্যাপারে মেঘ ও বজ্রঝড়ের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এসব কারণে বজ্রঝড়কে প্রাকৃতিক পরিকল্পনার একটি বিশেষ অর্থ হিসেবে পরিগণিত করা হয়।

বায়ু প্রবাহ (DRAFTS) ও দমকা হাওয়া

কিভাবে বজ্রঝড় গঠিত হয় সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলবার আগে বজ্রঝড়ের মাঝে যে দুটো সাধারণ গতি রয়েছে প্রথমে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

একটা বড় ধরনের বজ্রঝড় মিনিটে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত বড় হতে পারে। গ্রীষ্মকালের সবুজ মাঠে শুয়ে আপনি যদি সাধারণ দৃষ্টিতে আকাশে একটি ঝড়ো মেঘের বৃদ্ধি দেখতে থাকেন তা হলে দেখবেন যে এ ধরনের মেঘ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় না। আপনার দৃষ্টি শক্তির দ্বারা মেঘের দিক ও বক্রতা পরিবর্তন লক্ষ্য করা বেশ কঠিন হবে সন্দেহ নেই। আপনি যদি মেঘের গতিবিধি লক্ষ্য করতে চান তা হলে আপনি ছবি তোলার একটা সুন্দর কৌশলও ব্যবহার করতে পারেন। একটা মুভি (Movie) ক্যামেরা নিয়ে প্রতি ৫ সেকেণ্ড পর পর মেঘের ছবি নেওয়া শুরু করুন। ফিল্মটা ডেভেলপ (Develop) করে প্রতি ১৬টা ফ্রেম পর পর ছবিটি এবার ক্রমশঃ দেখতে শুরু করুন। আপনার দৃষ্টি শক্তির সক্ষমতা এবার ৮০ গুণ বেড়ে যাবে। এর ফলও কিন্তু হবে সত্যি বেশ আকর্ষণীয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অসংখ্য সাদা মেঘ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং তাদের অগ্রপ্রান্তের মেঘগুলো বেশ ফুলে ধুঁয়োর মত উপরের দিকে এগিয়ে চলেছে। যদিও মেঘের ঊর্ধ্বগতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বগামী তবুও চোখে দেখে প্রায়ই মনে হবে যে মেঘগুলোর মাঝে যেন ভাঁজ পড়ে গেছে। প্রতিটা ছোট ছোট মেঘগুচ্ছ মেঘের প্রতিকূল স্রোত মাত্র। ঊর্ধ্বগামী বাতাসের তুলনায় এগুলোর ব্যাস অনেক ছোট।

সাধারণতঃ ঊর্ধ্বগামী বাতাসকে বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহ (updraft) এবং ছোট ছোট আলোড়নকে দমকা হাওয়া বলা হয়। মেঘের মধ্যে পরিমাপ কাজ চালিয়ে ঝড়ের ঊর্ধ্বপ্রবাহ ও দমকা হাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। একটি গঠনশীল বজ্রঝড় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে হলে নদীর জলের গতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেয়া যাক। নদীর জলের গতি থেকে নবগঠিত বজ্রঝড়ের মাঝে কি হয় সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। আমরা সবাই জানি যে নদী কথার অর্থ হল একটি

জলধারা বিশেষ, যার মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে জলরাশি গড়িয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। নদীর সমস্ত জলই প্রায় বিনা বাধায় উচ্চ স্থান থেকে নীচে চলে আসে। কখনও বা নদীর কূলের কাছাকাছি যায়গায় ছোট ছোট ঘূর্ণি দেখা গিয়ে থাকে। নদীর মধ্যে একটা নৌকা যতক্ষণ বাধাহীন স্রোতের মাঝে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপ্রতিহত অবস্থায় ভেসে যেতে পারে। এই নৌকাটি ঘূর্ণি বা আলোড়নের মাঝে পড়লে তখন ঝাঁকুনি বা দোলা খেতে শুরু করে। এ ধরনের ঝাঁকুনি বা দোলাকে আপনি ইচ্ছে করলে (Turbulence) বল্‌তে পারেন। এ উদাহরণটি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, Turbulence-এর পরিমাণ একদিকে আলোড়নের শক্তি ও আয়তন এবং অন্যদিকে নৌকার গঠন ও তার গতির উপর নির্ভরশীল।

বজ্রঝড়ের বেলাতেও একই ব্যাপার। জলের ঊর্ধ্বস্রোতকে মোটামুটিভাবে বায়ুর অপ্রতিহত ঊর্ধ্বপ্রবাহ বলে মনে করা যেতে পারে। কোন বিমান যখন শুধুমাত্র বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহের মাঝে পড়ে তখন ঐ শক্তিটি বিমানটিকে শুধু উপরে নিয়ে যেতে থাকবে। এর ফলে বিমানে একটু ঝাঁকুনি বা দোলা অনুভূত হয়। কখনও বা এই দোলাটি মোটেই বোঝা যায় না। ঊর্ধ্বস্রোতের এবং নিম্নস্রোতের সঙ্গে নদীর মধ্যে প্রায়ই আলোড়নও দেখা গিয়ে থাকে। এ আলোড়নকে দমকা হাওয়া বলা হয়। সত্যি বলতে কি প্রমাণ করে দেখা গেছে যে আলোড়নের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দমকা হাওয়া বেশী শক্তিশালী হয়। এ জন্যই বিমানে 'Turbulence' হয়ে থাকে।

জলস্রোতের মাঝে নৌকার মত বিমানের Tusbulence ও দমকা হাওয়ার ধর্মের উপর নির্ভরশীল। যে সমস্ত আলোড়নের ব্যাস বিমানের পাখার আয়তনের চেয়ে বড় সেগুলোই সাধারণতঃ মারাত্মক। এ থেকে আপনারা যে কেউ সহজেই অনুমান করতে পারেন যে আলোড়নের গতি শক্তি যত বেশী হবে বিমান চালনার সময় তার প্রতিক্রিয়াও তত মারাত্মক হবে। যে-কোন দমকা হাওয়া থেকে দ্রুত গতি সম্পন্ন বিমান সবচেয়ে বেশী ও মারাত্মক ধরনের Turbulenee-এর সম্মুখীন হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি বহুদিন থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মটরগাড়ী থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ কথাটি ভাল করে বোঝা যাবে। গাড়ীতে স্বল্প গতিতে রাস্তায় চলার সময়

কোন জায়গায় উঁচু-নীচু থাকলে গাড়ীর স্বল্প গতিতে ঝাঁকুনি কম লাগে অথচ দ্রুত গতিতে ঝাঁকুনি বেশী মনে হয়।

উড়ার সময় বিমানের উপর বজ্রঝড় থেকে আসা বায়ুর বিভিন্ন গতির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বায়ুস্রোত ও দমকা হাওয়ার পার্থক্যটি ভালভাবে বোঝা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে বিমানের কি ভূমিকা রয়েছে তা-ও ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। বিমান চালনা সংস্থাগুলো বহুদিন থেকে এ বিষয়ে গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন। টারবুলেন্স কথার দ্বারা শুধুমাত্র বিমানের ঊর্ধ্বগতি বা গতিবৃদ্ধিই বুঝায় না। একথাটি বৈমানিকেরা বেশ ভাল করেই জানেন। এজন্য বিমানের দমকা হাওয়ার উৎপন্ন গতি (Derived gust velocity) বলে একটি পরিমাপক আবিষ্কার করা হয়েছে। বমানের ঊর্ধ্বগতি ছাড়াও বিমানের বিশেষত্ব ও গতি থেকে একটি সমীকরণের সাহায্যে এ পরিমাপকটি নির্ণয় করা যায়। একটি সঠিক সমীকরণ থেকে দমকা হাওয়ার একটা গতি পাওয়া যায় এবং তত্ত্বমূলকভাবে এ গতিটি বিমানের প্রতি সেকেণ্ডের উল্লম্বিক ত্বরণের সমান হয়ে থাকে। 'দমকা হাওয়ার উৎপন্ন গতি' সম্পর্কিত ধারণাটি একটা বেশ প্রয়োজনীয় তথ্য। এই বিশেষ তথ্য থেকে বিমানের কারিগরেরা কোন বিমানে যে-কোন দমকা হাওয়ার ফলাফল গণনা করতে সক্ষম হন। বজ্রঝড় পরিকল্পনার বিমানগুলোতে ঝড়ের মধ্যেকার বায়ুর ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রবাহ এবং দমকা হাওয়া মাপার জন্য কতগুলো যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল।

দুই ধরনের বজ্রঝড়

কোন কোন সময় বজ্রঝড় দেখতে কতকটা ছোট ছোট স্ফীত সাদা মেঘমালার মাঝে একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের মত মনে হয়ে থাকে। এ ধরনের মেঘগুলো ব্যাঙ-এর ছাতার মাঝে বড় রকমের ফুল কপির মত মনে হতে পারে। নীল আকাশে এসব মেঘের দীপ্তিময় চূড়া যখন গভীর হতে গভীরতর পথ মথিত করে উপরে উঠতে থাকে তখন তার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট মেঘগুলো এই নূতন দানবটির অস্তিত্বের মাঝে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এসব মেঘ বায়ুমণ্ডলের

খুব উঁচু স্তরে উঠে যায়। এ ধরনের উঁচু স্তরের বায়ু খুবই শীতল থাকে। এর ফলে এসব জায়গায় গঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এ সময় মেঘের প্রান্তভাগের বুনট পর্যন্ত পরিবর্তন হতে থাকে। এসব মেঘের প্রান্তগুলো তখন কিছুটা ঝাপসা হয়ে যায় এবং মেঘগুলো ক্রমশঃ প্রচণ্ড বাতাসের ফলে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘের চূড়াটিকে 'avnil'-এর মতো দেখা গিয়ে থাকে। এ সময় চারদিকে বিদ্যুতের ছটা দেখা যায় এবং বজ্রপাত শুরু হয়ে পড়ে।

যে-সব বিচ্ছিন্ন বজ্রঝড় সম্পর্কে একটু আগে আলোচনা করা হল সেগুলো সাধারণতঃ খুবই বেশী দেখা যায় না। তাই বলে এধরনের মেঘ খুব একটা বিরলও নয়। এ ধরনের মেঘের গঠন প্রক্রিয়া দেখতে পেলে খুবই ভাল লাগবে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ধরনের মেঘরাশি বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে দেখে আপনি হয়তো বা সমস্ত আকাশটাকে একটা বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা বলে মনে করবেন। সময় ও দূরত্বের সঙ্গে গভীর বারিপাত, বিজলীপাত, বজ্র এবং কখনও বা শিলাপাত সত্যি বড় রকমের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে থাকে। এসব দেখে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আপনার মাথার উপর এখন একটা বজ্রঝড় বিরাজ করছে। কিন্তু কয়টা বজ্রঝড় আছে? মানবিক বোধশক্তি দিয়ে এ উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর নয়। এ প্রশ্নটির সমাধানের জন্য একটা বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্তকারী বজ্রঝড়ের মাঝেও কতগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ঝড় গঠিত হবার সময় বা বায়ুর উচ্চ প্রবাহ ও নিম্ন প্রবাহের প্রারম্ভে ঝড়ের মধ্যবর্তী স্থানে খুব কম ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়ে থাকে। এগুলো এতই কম যে পর্যবেক্ষকেরা ঝড়ের মধ্যে এত স্বল্প বিশৃঙ্খল অবস্থা থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করতেও দ্বিধাবোধ করে থাকেন।

কিছুদিন আগে সব বজ্রঝড়কে একই ধরনের ব্যবস্থা বলে মনে করা হতো। সবাই ভাবতেন যে বজ্রঝড় এক বা একাধিক (cell) মেঘ নিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি মেঘেরই একটা বিশেষ সুসংবদ্ধ জীবনচক্র (lifecircle) রয়েছে।

পূর্বে ভাবা হতো যে একটি সাধারণ ঝড় ও একটি দুরূহ ঝড়ের মাঝে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে, প্রথমটির মাত্র একটি মেঘ (cell) দিয়ে গঠিত এবং দ্বিতীয়টি বহু মেঘের সন্নিবেশে হয়ে থাকে।

গত কয়েক বছর ধরে নানারকম নতুন প্রমাণের সাহায্যে দেখা গেছে যে "মেঘ বা মেঘমালার" (cellular)-এ প্রকল্পটি প্রকৃত প্রক্রিয়ার তুলনায় একটা খুবই সাধারণ তথ্য মাত্র। কতগুলো ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি বেশ কাজ করে আবার কতগুলো যায়গায় এগুলো মোটেই মেলে না। এখনকার পর্যবেক্ষণ ও ধারণা থেকে বোঝা যায় যে যে-সব বজ্রঝড় থেকে মারাত্মক রকমের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় সেগুলো শুধুমাত্র বৃষ্টিবাহী এবং সামান্য কিছু বিজলী ও বজ্রবাহী মেঘের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

মারাত্মক আবহাওয়া বলতে ১" ইঞ্চি ব্যাসের বেশী এবং কখনও বা ৩" ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট শিলাপাত, ঘণ্টায় ৬০ মাইলের বেশী ঝড় এবং কখনও বা টর্নেডো বোঝান হয়ে থাকে। এ ধরনের বজ্রঝড় সাধারণতঃ সারিবদ্ধভাবে একের পর এক করে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে। কখনও বা এ ধরনের মেঘের সারি কয়েক শত মাইল বিস্তৃত হতে পারে। এসব বজ্রঝড় তাদের চলার পথের স্থানগুলোর ফসল ও সম্পত্তি বিনষ্ট করে এগিয়ে চলতে থাকে। কখনও বা এসব ঝড় মানুষের অঙ্গহানি বা জীবননাশেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আর এক ধরনের বজ্রঝড় যেগুলো আরও বেশী বিচ্ছিন্ন এবং এক ঘণ্টা বা ঐ রকম সময় পর্যন্ত বিরাজ করে সেগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করা সম্ভবতঃ সবচেয়ে সোজা। এগুলোকে সাধারণতঃ 'স্থানীয় ঝড়' বলা হয়। অবশ্য কখনও বা একটি বিচ্ছিন্ন বজ্রঝড় থেকে হঠাৎ করে একটা বড়ঝড় বা মুষল ধার বৃষ্টি ও শিলাপাত হতে পারে। অবশ্য এ ধরনের আবহাওয়া শুধুমাত্র স্থানীয় আবহাওয়া থেকে সৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর নয়। প্রথমে আসুন আমরা স্থানীয় ঝড়ের কতগুলো বিশেষত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা করে নেই। এর পর আমরা সুগঠিত মারাত্মক ঝড় সম্পর্কে আলোচনা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

স্থানীয় বজ্রঝড়

বজ্রঝড় গঠনের জন্য বায়ুমণ্ডলের অবস্থাগুলো সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলের বেশ কিছু স্তর অর্থাৎ ১০,০০০ ফুট বা তার চেয়েও উঁচু স্থান পর্যন্ত বায়ুকে আর্দ্র হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ স্থানের বায়ুমণ্ডলটিকে অস্থিতিশীল হতে হবে। এ ছাড়াও আকাশে সকালের দিকে কিছুটা মেঘ থাকতে হবে যাতে করে সূর্যরশ্মি ভূমি ও ভূপার্শ্বস্থ বায়ুগুলোকে উত্তপ্ত করতে পারে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এ তিনটা বিষয় সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিয়েছি। এখন এগুলো আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা যাক্।

অস্থিতিশীল বায়ু

এ আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে আমাদের জান্‌তে হবে যে আবহাওয়াবিদরা বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা বলতে কি বোঝাতে চান? খুব সহজভাবে বলতে গেলে এর অর্থ হল এই যে একটু শক্তি প্রয়োগ করলেই এ অবস্থায় নিম্ন স্তরের বায়ু বহু উপরে উঠে যেতে পারে। একইভাবে বলতে গেলে পর্বত চূড়ায় অবস্থিত দোদুল্যমান বড় বড় পাথরগুলোকেও অস্থিতিশীল বলা যেতে পারে। নীচের দিকে একটু ধাক্কা পেলেই এসব পাথর ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে নীচের দিকে পড়তে শুরু করে এবং তার সাথে আরও পাথর ও শিলা নীচে পতিত হয়ে থাকে। এ ধরনের শিলাপাতের ফলে হয়তো বা হিমবাহের সৃষ্টি হতে পারে। এখন স্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলের ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট কিছু ঊর্ধ্বগামী বায়ু সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা যাক্। ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট বায়ু ক্রমবর্ধমান শক্তিতে উপরে উঠতে হলে তার পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের তুলনায় এগুলোকে বেশ হাল্কা হতে হবে। একই কারণে হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ বেলুন উপরে উঠে থাকে। এই গ্যাসটি বায়ুর তুলনায় হাল্কা। (আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে পদার্থবিদরা বলবেন ঘনত্ব অর্থাৎ হিলিয়ামের প্রতি

একক আয়তনের ওজন বায়ুমণ্ডলের প্রতি একক আয়তনের চেয়ে কম) বর্ণিত বায়ুটুকু উপরে উঠতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ বায়ুর ঘনত্ব পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের চেয়ে কম থাকবে। তাপ বৃদ্ধি পেলে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়; ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশিষ্ট আয়তনের বায়ু তার পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের চেয়ে উষ্ণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বায়ুগুলো উপরের দিকেই উঠতে থাকবে।

বায়ুমণ্ডলে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে থাকে। উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপ হ্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের অস্থিতিশীলতা বেড়ে যায়। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে ঊর্ধ্বগামী শুষ্ক বায়ু অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রাবিশিষ্ট স্থানে প্রবাহিত হয় বলে ক্রমশঃ এগুলো আয়তনে বেড়ে যায়। এর জন্য এসব বায়ুর পরে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। প্রতি হাজার ফুট উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা সাধারণতঃ ৫·৫° ফাঃ কমে যায়। এই বিশেষ সংখ্যাটিকে বায়ুর শুষ্ক "adiabatic" তাপ হ্রাস মান বলা হয়ে থাকে। এখন দেখা যায় যে শুষ্ক বায়ু উপরে উঠতে হলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার হ্রাস প্রতি ১০০০ ফুটে ৫·৫° ফাঃ এর চেয়েও কম হতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানে বিশেষ করে মরুভূমি অঞ্চল ব্যতীত এ ধরনের অবস্থা খুব কমই দেখা গিয়ে থাকে। এ অবস্থা বিরাজ করলে বায়ুমণ্ডলে "thermals" বা বয়জ্যেষ্ঠ বৈমানিকদের ভাষায় "air pocket"-এর সূচনা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় বিমান যাত্রা বেশ কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। এ সময় ঊর্ধ্বচাপ বা দমকা হাওয়া খুব একটা বেশী হয় না—কিন্তু এগুলো বুঁদ-বুঁদের ন্যায় অসংখ্য পরিমাণে দেখা যেতে পারে। এর ফলে বিমানে সব সময় ঝাঁকুনি ও ধাক্কা অনুভূত হয়ে থাকে।

গভীরতম স্থান পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল যদি শুষ্ক হতো তা হলে কখনই বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হতো না। এ অবস্থায় ঊর্ধ্বগামী বায়ু "শুষ্ক adiabatic তাপ হ্রাসের" ফলে কিছু উপরে গিয়ে এমন একটি স্তরে পৌঁছত যেখানে এসব বায়ুর তাপমাত্রা তার পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার সমান। এর ফলে এসব বায়ুর ঊর্ধ্বগতি ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে পরে থেমে যেতে বাধ্য হতো। এ অবস্থায় বায়ুর উৎস শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার ফলে ঊর্ধ্বগামী শক্তি উপরের স্তর

ভেদ করে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। এর জন্য ভূ-পৃষ্ঠের তাপশক্তি ছাড়া অন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন।

বায়ু যখন আর্দ্র হয় তখন আরও একটি শক্তি ব্যবহৃত হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ু সূর্যকিরণের ফলে বেশী তাপ পায় এবং তখন সে-সব বায়ু পূর্বে বর্ণিত "শুষ্ক adiabatic" পর্যায়ে উপরে উঠতে থাকে। অবশ্য উপরে উঠে খুব শুষ্ক বায়ুর মতো শক্তি হারিয়ে ফেলার আগেই যদি এসব বায়ু ঘনীভবনের স্তরে পৌঁছে যেতে পারে তা হলে আর একটি নতুন শক্তির সূচনা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় প্রতি গ্রাম জলে ৫৯৭ ক্যালরি সুপ্ত তাপের শক্তি বায়ু থেকে নির্গত হতে থাকে। পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঘনীভবন প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় এবং তাপ হ্রাসের মাত্রা প্রতি ১০০০ ফুটে ৫·৫° ফাঃ হাঃ থেকে নেমে ৩·৩° ফাঃ এ দাঁড়ায়। এ নতুন সংখ্যাটিকে বায়ুর "আর্দ্র adiabatic তাপমাত্রা হ্রাসের" পরিমাণ বলা হয়।

ঘনীভবন শুরু হবার পর উর্ধ্বগামী বায়ুর উর্ধ্বগতিও বেড়ে যায়। বায়ু এবার ক্রমশঃ উপরে উঠতে শুরু করে। এসব বায়ুর পার্শ্ববর্তী বায়ুর তাপমাত্রা আর্দ্র adiabatic তাপমাত্রার হ্রাসের চেয়ে বেশী না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে এ ধরনের অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় এর ফলে এসব বায়ুতে বড় বড় "পরিচলন মেঘ" এবং বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়।

একটা বজ্রঝড় তৈরীর সময়

স্থানীয় বজ্রঝড় গঠনের পূর্বে সাধারণতঃ প্রথমে "পরিচলন প্রক্রিয়া" শুরু হয়। দুপুরের কাছাকাছি সময় যখন ভূমির তাপ বৃদ্ধি পায় তখনই তুলোর মতো মেঘের সূচনা হয়ে থাকে। এসব ছোট ছোট মেঘকে "কিউমুলাস" মেঘ বলা হয়। এগুলো সাধারণতঃ প্রায়ই আকাশে দেখা যায়। (১নং চিত্রে দেখুন) প্রথমাবস্থায় ছোট ছোট মেঘ পাঁচ মিনিটের চেয়ে কম সময় স্থায়ী হয়। এ সময়ে পুরাতন মেঘগুলো জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় এবং একইভাবে আবার নতুন মেঘের সৃষ্টি হতে থাকে। সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এসব "কিউমিলি"-গুলো আরও বড় আকার ধারণ করে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে।

এর প্রতিটি মেঘই শুষ্ক বায়ুর সংস্পর্শে এসে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয়ে এ মেঘগুলো বায়ুর আদ্রর্তা বৃদ্ধি করতে থাকে। ক্রমশঃ আকাশের মেঘ সংখ্যা অনেক বেশী ও বড় আকার ধারণ করে। অবশেষে কিছু সংখ্যক মেঘ মিলে প্রায় ১ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটি ঊর্ধ্বগামী বায়ু স্তরের সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ মেঘমালার ভিতরের স্তরের বায়ু তার পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের তুলনায় উষ্ণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এসব উপরে উঠতে থাকে। যখন এ মেঘের পার্শ্ববর্তী বায়ুর চাপ উষ্ণতার সঙ্গে দ্রুত গতিতে হ্রাস পেতে শুরু করে তখন এ মেঘমালার ভিতরের বায়ুর ঊর্ধ্বচাপ দ্রুততর হতে থাকে। এ সময়ে মেঘের চূড়া প্রতি মিনিটে ১০০০ থেকে ২০০০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠতে শুরু করে। এসব সাদা মেঘের বেশ কিছুটা বিশেষত্ব রয়েছে। এ অবস্থায় এই মেঘকে "cumulus congestus" বলা হয়ে থাকে। (১ নং চিত্রে দেখুন)

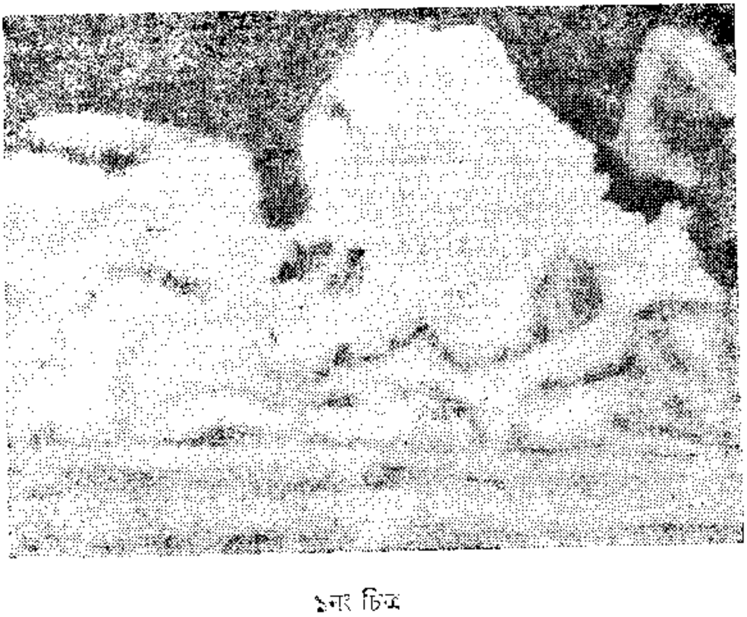

১নং চিত্র

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বজ্রঝড় গঠনের জন্য বায়ুগুলকে আর্দ্র ও অস্থিতিশীল হতে হবে। সে সময়ে একথাও বলা হয়েছে যে বায়ু আর্দ্র

হলে তা থেকে সুপ্ত তাপ পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের বায়ুর পুরুস্তরে অধিকতর আপেক্ষিক আর্দ্রতা আর একটি কারণের জন্য বেশ প্রয়োজনীয়। বায়ু যখন অধিকতর আর্দ্র হয়, উদীয়মান মেঘমালায় তখন আস্তে আস্তে ঘনীভবন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

উচ্চ-নীল আকাশের দিকে বিস্তৃত হবার সময় 'cumulus congestus" মেঘের উপরে ও ধার দিয়ে কিছু পরিষ্কার বায়ুর সংমিশ্রণ হয়ে থাকে। পরিষ্কার বায়ু মেঘের বায়ুর সঙ্গে মেশার ফলে মেঘবিন্দুতে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাষ্পীভবনের ফলে যে পরিমাণ মেঘবিন্দু পরিষ্কার বায়ুকে জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ করতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ মেঘবিন্দুই এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাষ্পীভূত হয়। আমরা পূর্বেই জানি যে বাষ্পীভবনের ফলে বায়ুর তাপ কমে যায়। এর ফলে কিছু ভারি বায়ুর সৃষ্টি হয় এবং এসব বায়ুর ঊর্ধ্বগতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে। মেঘের বাইরে বায়ু যখন জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যখন এসব বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ১০০ ভাগ হয়ে পড়ে তখন মেঘবিন্দুর বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া কমে যায়। অন্যদিকে এই মেঘ দ্বারা পরিবেষ্টিত বায়ুমণ্ডল যদি খুব শুষ্ক হয় (উদাহরণ স্বরূপ যদি এর আপেক্ষিক তাপমাত্রা শতকরা ১০ ফাঃ হয়) তবে বায়ুর মিশ্রণ ও মেঘের বাষ্পীভবনের ফলে বায়ুর তাপ এত কমে যেতে পারে যে তার ফলে পরে আর কোন রকম মেঘ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যেতে পারে।

বায়ু যদি অস্থিতিশীল ও আর্দ্র হয় সে অবস্থার কথা এবার ভেবে দেখা যাক। cumulus congestus মেঘগুলো কতকটা ডিমের মতো যা থেকে বজ্রঝড় তা দেওয়া হয়। যখন মেঘের বায়ু দ্রুত থেকে দ্রুততর শক্তিতে উপরে উঠতে থাকে। তখন তার সঙ্গে বহু রকমের প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে।

সর্বপ্রথম যে-সব মেঘবিন্দু মেঘের ভূমি ভাগে গঠিত হয় সেগুলো ঊর্ধ্বগামী বায়ুর সঙ্গে উপরে উঠতে থাকে। এ ধরনের মেঘবিন্দুর ব্যাস হয় মাত্র ২০ মাইক্রনের মত। স্থির বায়ুতে এসব মেঘবিন্দু প্রতি মিনিটে ২ ফুট করে নীচে পড়তে পারে। বায়ুর ঊর্ধ্বগতি এ তুলনায় ১০০ গুণ বেশী হওয়ার ফলে এসব জলবিন্দু ক্রমেই উপরে উঠতে থাকবে। পরে যখন এসব জলবিন্দু মেঘের উঁচু স্তরে পৌঁছে তখন এগুলো ক্রমশঃ বড় হতে শুরু করে। এ সময়ে

বড় জলবিন্দুগুলো ছোট ছোট জলবিন্দুর সঙ্গে একত্র হতে শুরু হয়। এর ফলে এদের ব্যাস খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। cumulus congestus অবস্থায় ২০ মিনিট পর মেঘের বড় বড় জলবিন্দুকে ছোট ছোট বারি বিন্দুও বলা যেতে পারে। তখন এসব বারি বিন্দুর ব্যাস ১০০ থেকে ২০০ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মকালে ভূমি থেকে মেঘের নিম্নস্তরের উচ্চতা দাঁড়ায় ৫০০০ ফুট। একটি মেঘের উচ্চতা ২৫০০ ফুট উপরে পৌঁছার পূর্বে এখানকার মেঘের উচ্চস্তরে ছোট ছোট বারি বিন্দুর সূচনা হয়। এর আরও ৫ মিনিট পরেই মেঘের নিম্নস্তর থেকে বারিপাত হতে দেখা যায়। এই সময় মেঘের উচ্চতা কিছু বাড়তেই থাকে।

দেখা গেছে যে গ্রীষ্মকালে মধ্য-পশ্চিম আমেরিকায় ৩২° ফাঃ তাপমাত্রার স্তর ১৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই বিশেষ স্তরটিকে সাধারণতঃ হিমাঙ্কের স্তর বলে অভিহিত করা হয়। এ নামকরণটি আজকাল আর বেশী ব্যবহৃত হয় না। এই বিশেষ স্তরটিকে এখন গলাঙ্কের স্তর বলা হয়ে থাকে। শব্দ প্রয়োজনের এই বাক্ চাতুরিটি পদার্থবিদ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে আর একটা গূঢ় অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মেঘবিন্দু বাতাসের ঊর্ধ্বগতির ফলে ৩২° ফাঃ তাপের স্তরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই বরফে পরিণত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এসব জলকণা ৩২° ফাঃ তাপমাত্রার নীচেও তরল পদার্থ আকারে বিরাজ করে। এ স্তরে এ ধরনের জলকণা "অত্যধিক শীতল" হয়ে থাকে। cumulus congestus মেঘের মাঝে প্রায়ই ০° ফাঃ তাপমাত্রাবিশিষ্ট "অতি শীতল" জলকণা দেখা যায়। কখনও বা ছোট ছোট জলকণা ৩৮° ফাঃ পর্যন্ত "অতি শীতল" অবস্থায় বিরাজ করে। স্ফটিকাকার বরফের টুকরা বা তুষার রাশি মেঘের উপরের স্তর থেকে ৩২° ফাঃ তাপের স্তরে নামার সঙ্গে সঙ্গে গল্‌তে শুরু করে। এ জন্যই আজকাল এ বিশেষ স্তরটির নাম "গলাঙ্কের স্তর" হিসেবে সর্বজন পরিচিত হয়ে আস্‌ছে।

এখন আবার নির্মীয়মান "cumulus congestus" সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক্। এ মেঘের চূড়ো এখন ২৫০০০ ফুট উপরে উঠে গেছে, কিন্তু মেঘটি এখন নির্জীব হয়ে পড়েনি। এই মেঘের মাঝে এখন ৫° ফাঃ তাপমাত্রার বড় বড় "অতি শীতল" জলবিন্দুর সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। মাঝে মাঝে

স্ফটিকের মতো বরফও গঠিত হয়েছে এতে। এ সময় বৃষ্টি ও মেঘ বিদ্যুতের কাজও শুরু হয়ে থাকে। বজ্রঝড় গঠনের এ পর্যায়কে বজ্রঝড় পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিকেরা cumulus পর্যায় বলে অভিহিত করেন। ২নং চিত্রে ঊর্ধ্বগামী বাতাসের গতির একটি সহজবোধ্য বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে মেঘের সৃষ্টির ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহ।

মেঘের সমস্ত বায়ুই উপরে উঠ্ছে ভাবলে কিন্তু মস্তবড় একটা ভুল ধারণা পোষণ করা হবে। ২নং চিত্রে উল্লিখিত মেঘের মাঝ দিয়ে বিমান চালনার সময় বৈমানিক বায়ুর ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রবাহ একইভাবে উপলব্ধি করতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় মেঘের মধ্যেকার বায়ুর গড় গতি হবে ঊর্ধ্বমুখি। মেঘের মাঝে বায়ুর ঊর্ধ্বগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যামুলক কোন সঠিক গঠন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত স্থায়ী করা সম্ভবপর হয়নি। বজ্রঝড় পরিকল্পনার বৈমানিকরা কতগুলো "cumulus" মেঘের প্রতি স্তরে শুধুমাত্র বায়ুর ঊর্ধ্বগতিই উপলব্ধি করেছেন। এর জন্য হোরস আর বায়ারস এবং রস্কো আর ব্রাহাম বজ্রঝড়ের 'রন্ধ্রপূর্ণ cellular" থিওরি তৈরী করতে গিয়ে বায়ুর ঊর্ধ্বগতিতে কতকটা চুল্লির চিমনির মতো ব্যবস্থা বলে অনুমান করেছেন। অন্যদিকে আর. এস. স্কোরার ও এফ. এইচ. লাডলাম বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহকে বাতাসের কতগুলো বুঁদ বুঁদের সমষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। এঁদের মতে ঊর্ধ্বগতির মাঝে একটি দুর্বল ও আর একটি শক্ত অংশ রয়েছে। বুঁদ বুঁদের ভিতরে এবং তার "উদীয়মান" অংশে পরীক্ষা করলে দুটো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দুটো মতবাদের কোনটাই প্রমাণ করার মতো বৈজ্ঞানিক পরিমাপক যন্ত্র আজও তৈরি করা সম্ভবপর হয়নি। বজ্রঝড় পরিকল্পনার বিমান থেকে পাওয়া পরিমাপকগুলো দিয়ে বায়ুস্তরের থিওরির অধিকাংশ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। কিন্তু সব সময়ের জন্য এ থিওরি প্রযোজ্য নয়। কখনও বা কোন স্তরে অর্থাৎ মনে করা যাক ১৫০০০ ফুট উঁচুতে বেশ শক্তিশালী ঊর্ধ্বপ্রবাহ দেখা গেল—এ সময় হয়তো আর এক উচ্চতার উদাহরণস্বরূপ ১০০০০ ফুট উঁচুতে হয়তো বা তখন বেশ দুর্বল ধরনের ঊর্ধ্বগতি রয়েছে। অবশ্য যুক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে যে বায়ুর Draft-এর আপেক্ষিক গতির সঙ্গে বিমানটি সরে যাওয়ার ফলে এ ধরনের ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে। বিমানটি ১০০০০

ফুট উচ্চতায় এ প্রবাহের ধার দিয়ে উড়ে গিয়ে থাকলে এ প্রবাহটির ভিতর দিয়ে না যাওয়ার জন্যও এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

উদীয়মান পরিচলন মেঘের চূড়ার আকৃতি বজ্রমেঘের বুঁদবুঁদ থিওরির অন্যতম প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ ধরনের মেঘে এক প্রকার ঢেউয়ের লক্ষণ দেখা যায়। মেঘমালা কখনও একটি "শক্ত পদার্থের" (Rigid body) মতো উপরে উঠে না। বরফ মেঘের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে মেঘের এক দিকের একটি অংশ চাবির মত উপরের দিকে উঠে যায়। পরে এ অংশটির গতি কমে যায় এবং আর এক দিকের মেঘের চূড়া উপরে উঠতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠে গঠিত বায়ুর বুঁদবুঁদ ক্রমশঃ উপরে উঠে বলেই মেঘ এভাবে উপরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে বলে যুক্তি দেখান হয়।

বায়ুর ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আজকাল বহুসংখ্যক গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। কয়েক বছরের মধ্যেই নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে একটা সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। এর মধ্যে cumulus মেঘের অবস্থায় মেঘের ঊর্ধ্বগতির সময় বায়ুর গড় গতি সম্পর্কে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা করতে হবে। মেপে দেখা গেছে যে cumulus মেঘের মাঝে প্রতি মিনিটে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বপ্রবাহ খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ ধরনের শক্তিশালী ঊর্ধ্বপ্রবাহের সঙ্গে প্রায়ই বেশ কিছুটা দমকা হাওয়া থাকে। ভুল করে এসব মেঘে কোন বিমান ঢুকে গেলে বেশ বড় ধরনের টারবুলেন্সের সম্মুখীন হবে সন্দেহ নেই।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রাহাম বজ্রঝড় পরিকল্পনার Data ব্যবহার করে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে ঊর্ধ্বপ্রবাহের ফলে কত পরিমাণ বায়ু উপরে উঠতে পারে তা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। বজ্রমেঘের ঊর্ধ্বগতির সময় গড়ে ৮০০০ টন বায়ু প্রতি সেকেণ্ডে উপরে উঠে থাকে। নিশ্চয়ই এটা একটা বিরাট আয়তনের বায়ু কিন্তু এর সঙ্গে আপনি যদি একটা "সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের" তুলনা করেন তবে এ সংখ্যাটি খুবই ছোট বলে মনে হবে। আমরা প্রায়ই বায়ুকে একটা ওজনহীন পদার্থ বলেই মনে করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে বায়ু সত্যিই খুব হাল্কা পদার্থ। তবু আপনার কাছে যদি বেশী পরিমাণ বায়ু থাকে তবে তার ওজনও নিসন্দেহে বেশী হবে।

যাই হোক, কিউমুলাস মেঘের মাধ্যমে বেশ পরিমাণ বায়ু ধূম নলের মতো উঁচু স্তরে উঠে যেতে সক্ষম হয়। এ ধরনের মেঘ বেশীর ভাগ সময়েই সর্ব-প্রথম ভূ-পৃষ্ঠের অতি সন্নিকটে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বগতি শুরু হলে বায়ু মেঘের দিকে এগুতে থাকে। এ সময় মেঘ থেকে বহু মাইল দূরের বায়ুও মেঘের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। বেশ সুগ্রাহী (sensitive) যন্ত্র দ্বারা মেঘের দিকে আগত বায়ুর অস্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়। যখন বায়ুর ঊর্ধ্বগতি শুরু হয় তখন এসব মেঘের বাইরেও বায়ু জমা হতে থাকে। আবহাওয়াবিদরা বলেন যে ঊর্ধ্বগতির মাধ্যমে মেঘের মাঝে দ্রুত গতিতে বাইরে থেকে অন্য বায়ুর আগমন হয়ে থাকে।

বায়ু উপরে উঠতে থাকলে ধূম নল ও মেঘের চূড়া উপরে উঠতে থাকে এর ফলে তার পার্শ্ববর্তী স্থানের বায়ুগুলো আর একদিকে সরে যায়। এভাবে সব বায়ুই সরে যেতে পারে না। আমরা পূর্বে বলেছি যে মেঘের চূড়াতেও বাইরে থেকে আসা দ্রুতগতিসম্পন্ন বায়ুর সঙ্গে আবহাওয়ার উঁচু স্তরের বায়ুমণ্ডলের ধাক্কার ফলে কি হতে পারে। এ সম্পর্কে আবার একটু চিন্তা করে দেখা যাক। প্রশ্নটির উত্তর বেশ স্বাভাবিক। প্রথমে এ বায়ুগুলো অনুভূমিকভাবে উপরে যেতে থাকে এবং পরে এদের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে নীচে পড়তে শুরু করে। বায়ুর এই নিম্ন প্রবাহ ঊর্ধ্বপ্রবাহের তুলনায় বহু স্থান নিয়ে শুরু হয়।

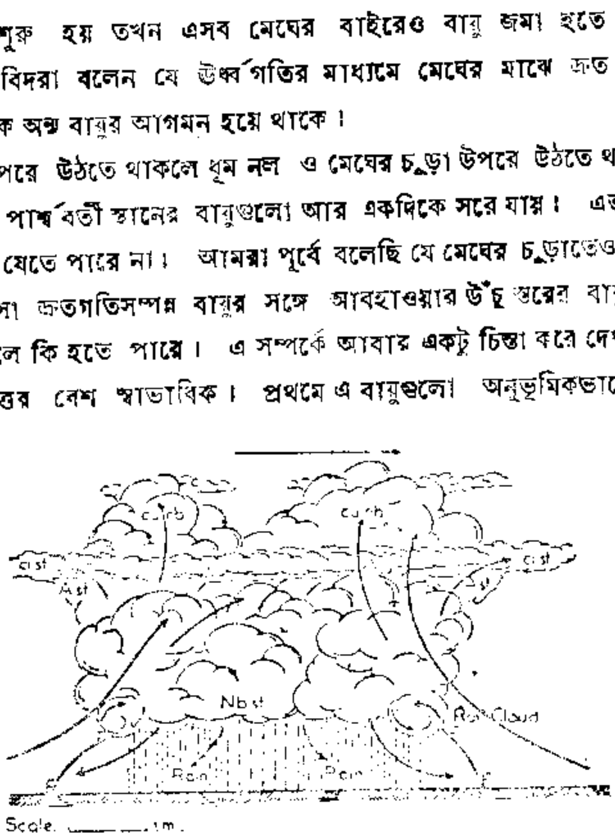

২নং চিত্র

তিন নং চিত্রে cumulus মেঘের পূর্ণ গঠনপ্রণালী দেখান হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই মেঘে বায়ুর বিভিন্ন প্রবাহ পূর্বে বর্ণিত জলীয় পদার্থের পরিচলন প্রক্রিয়ার অনুরূপ। পরিচলন মেঘ ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী উষ্ণ বায়ু উপরের শীতল স্তরে স্থানান্তরিত করে থাকে।

পরিণত অবস্থায় বজ্রঝড়

কিউমুলাস কনজেস্টাস (cumulus congestus) উপরে উঠতে থাকলে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি (up draft)ও ক্রমশঃ বেশী হতে থাকে। তখন মেঘের মধ্যেকার বৃষ্টি বিন্দু ও বরফের টুকরোগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে আয়তনে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ সময় বৃষ্টিবিন্দু এত বড় হয়ে যায় যে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি আর এগুলোকে উপরে ধরে রাখতে পারে না। এরূপ অবস্থায় এসব জলবিন্দু মাটিতে পড়া শুরু করে। বৃষ্টি, তুষার ও শিলার ওজনের সমষ্টি বেশী হলে মেঘের মধ্যে এক প্রকার নিম্নগতির সূচনা হয়ে থাকে। এ শক্তি মেঘের মধ্যেকার বায়ুর ঊর্ধ্বগতি প্রতিহত করতে পারে। যদি এই ওজন খুব বেশী হয় তবে মেঘের মাঝামাঝি স্তরে একটা নিম্নগতির সূচনা হয়।

যখন নিম্নগতি শুরু হয় তখন তার স্খলনও খুবই দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। বায়ু নীচে নামার সময় যখন উচ্চ চাপমাত্রাবিশিষ্ট স্তরে পৌঁছায় তখন সংকোচনের জন্য বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এ অবস্থায় যদি কোন জলীয় বাষ্প বা বরফ না থাকতো তবে বায়ুর তাপ প্রতি ১০০০ ফুটে ৫'৫০° ফাঃ করে বেড়ে যেত। এই বিশেষ তাপের গতি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। যা হোক বজ্রঝড়ে বেশ পরিমাণ জলীয়বাষ্প ও বরফ থাকে। এগুলোর জন্য বায়ুর মাঝে বাষ্পীভবন হয় এবং ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কমে যায়। এর জন্য তাপমাত্রার হার প্রতি ১০০০ ফুট ৩'৩০° ফারেনহাইটে নেমে আসে। পার্শ্ববর্তী বায়ুর তাপ নীচের দিকে বেশ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বলে নিম্ন প্রবাহের চারধারের বায়ু তুলনামূলকভাবে বেশ ঠাণ্ডা ও ভারী অবস্থায় দ্রুতগতিতে নীচে নামতে শুরু করে। বৃষ্টি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছার পূর্বেই বজ্রঝড়ের মাঝে ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির প্রক্রিয়া সমপর্যায়ে কাজ করতে থাকে।

এ সময় ঝড়টি তার পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। ৪নং চিত্রে মেঘের মাঝে এ সময়কার বায়ুর গতির দিক দেখান হয়েছে।

পরিণত অবস্থায় বজ্রঝড় তার দুর্বার জীবনের চরম শিখরে উপনীত হয়। এ সময় মেঘের ঊর্ধ্বগতি আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রথম অধ্যায়ে একটি পরিণত ঝড়ের মাঝে বিমান চালনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে সেই বিশেষ ঝড়ের মাঝে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি ছিল প্রতি মিনিটে ৫,০০০ ফুট। মেঘের ঊর্ধ্বাংশে এর চেয়েও বেশী ঊর্ধ্বগতি উপলব্ধি করা যেতে পারে।

পরিণত ঝড় (stratosphere)-এ অর্থাৎ ৬০,০০০ ফুটের অধিক উঁচু স্তরেও উপনীত হতে পারে। বড় বড় বজ্রঝড়ের মেঘ প্রায়ই stratosphere-এর ৫০,০০০ ফুট উঁচু স্তরে পৌঁছে থাকে। ঊর্ধ্বগতি বেশী শক্তিশালী না হলে মেঘের চূড়া অত উপরে পৌঁছাতে পারে না। এর কারণ কিন্তু অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংজ্ঞা অনুসারে যে স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না অথবা উচ্চতার সাথে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই স্তরকে stratosphere বলা হয়। এ রকম স্তর খুবই স্থিতিশীল। কিছু পরিমাণ ঊর্ধ্বগামী বায়ু (moist adiabatic) মাত্রায় উপরে উঠার সময় উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার স্থিতিশীল অবস্থায় উপনীত হলে সেখানকার বায়ুর তাপ তার পার্শ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অনেকগুণে কমে গিয়ে থাকে। এর ফলে এসব বায়ুর ঊর্ধ্বগতিও কমে যায়। এর পরেও এরূপ বায়ু কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠে যেতে পারে। ঊর্ধ্বগতির শক্তি momentum হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

এডি লিটিল্ ইনকরপরোটেডের তন সার্ট বায়ুর ঊর্ধ্বগতির ফলে কত তাড়াতাড়ি বজ্রঝড় stratosphere ভেদ করে উপরে উঠতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য একটা সোজা নিয়মের প্রবর্তন করেন। এই নিয়মটির নাম হল "বৃদ্ধাঙ্গুলের পদ্ধতি"। (rule of thumb) তার এই নিয়মটির অর্থ হল এই যে—stratosphere-এর ভূমি থেকে বায়ুর ঊর্ধ্বগতির হার প্রতি ১,০০০ ফুট-এর অন্তর্ভেদীর জন্য প্রতি সেকেণ্ডে ২০ ফুট মাত্র।

রাডার পর্যবেক্ষণের দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক বজ্রঝড়ের বেলায় stratosphare-এর ৫,০০০ ফুট উপরে ও মেঘে চূড়ো দেখা গিয়েছে। stratosphere-এর মধ্যে ১৫,০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত বেশ বড় ধরনের বজ্রঝড়ের কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। এসব পর্যবেক্ষণ সত্য হলে এ ধরনের বজ্রঝড়ের ঊর্ধ্বগতির হার দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ঘণ্টায় ২০৫ মাইল। এটা সত্য অবিশ্বাস্য ধরনের ঊর্ধ্বগতির পর্যায়ে পরিগণিত হতে পারে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এসব অতিরিক্ত উচ্চতার বেলায় উচ্চতা নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। যা হোক রাডার দিয়ে দেখা stratosphere-এর ৫০০০ ফুট থেকে ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় বজ্রঝড়ের দৃষ্টান্ত আজকাল খুব বিরল নয়। রাডার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পরিণত অবস্থায় কতগুলো বজ্রঝড়ের মাঝে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০ ফুটের উপরে হতে পারে।

১৯৬২-৬৩ সালে এ বিষয়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ গবেষণার ফলে বড় বড় বজ্রঝড়ের উপরের দিকের বায়ুর ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কীয় কতগুলো তথ্য জানা যায়। এ সময় বড় বড় ঝড়ের মাঝে ৪০,০০০ ফুট উচ্চতায় বিমান চালনা করা হয়। এ গবেষণায় জানা গেছে যে এসব বিমান প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ ফুটেরও বেশী বায়ুর ঊর্ধ্বগতির সম্মুখীন হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে অন্যান্য গবেষণার বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। এখন আমাদের শুধু এটুকু জানতে হবে যে বজ্রঝড়ের শক্তিশালী ঊর্ধ্বগতির দ্বারা আমরা এই বুঝতে পারি যে এসব ঝড়ের উপরের দিকের বায়ুর ঊর্ধ্বগতির হার খুবই দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

তিন নম্বর চিত্রের বজ্রঝড় পরিণত অবস্থায় মধ্য পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। stratosphere-এর স্থিতিশীল স্তরের প্রভাবে উপরের অংশের মেঘগুলো বাইরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কতক সময় এ থেকে সুদূরপ্রসারী “নেহাই”-এর মতো মেঘের সূচনা হয়। উপরের মেঘ শুধুমাত্র বরফের স্ফটিক দ্বারা গঠিত থাকে বলে এ সময় মেঘের বুনটেরও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ অবস্থার সময় মেঘের চূড়াতে বা তার নিকটবর্তী স্থানের তাপমাত্রা ৬০° ফাঃ বা ৭০° ফাঃ পর্যন্ত নীচে নেমে যায়।

পরিণত অবস্থার সময় মেঘের মাঝে নিম্নগতির সূচনা হয়। ভূ-পৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের মাত্রা তখন বেশ বেড়ে যায়। বৃষ্টি বিন্দুর ব্যাসের আয়তন এ সময়ে ৫ মিঃ মিঃ পর্যন্ত হতে পারে। স্থির বায়ুর মাঝে বারি বিন্দুর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৯ মিটার বা প্রতি মিনিটে ১৮০০ ফুট পর্যন্ত দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু এসব বারিবিন্দু তার চেয়েও দ্রুতগতিতে মাটিতে পড়তে থাকে। এসব বারিবিন্দু যে ধরনের বাতাসের মধ্যে থাকে তার গতি প্রতি মিনিটে ২৪০০ ফুটেরও বেশী বলেই এটা সম্ভবপর হয়।

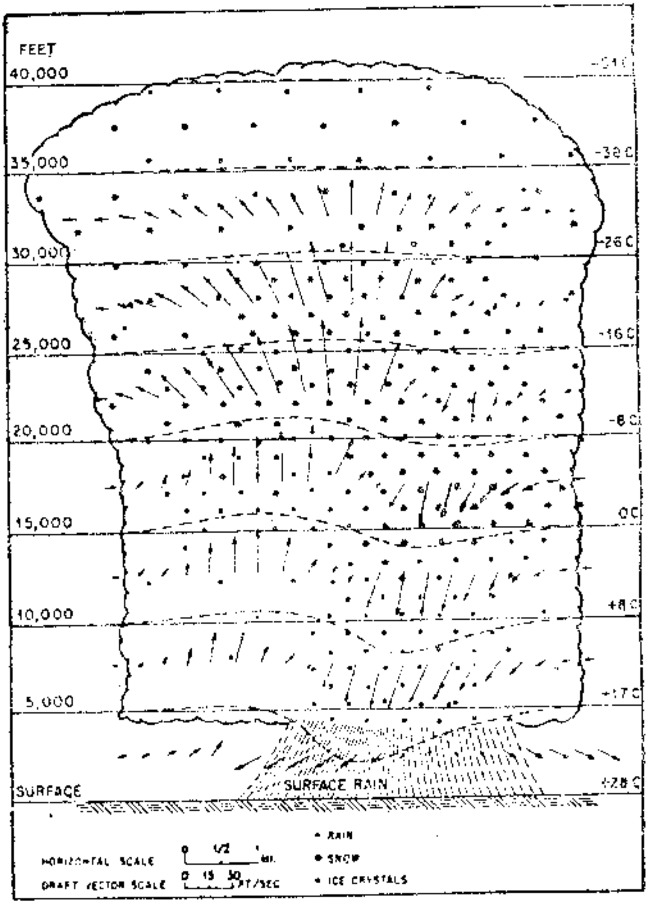
FEET
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
SURFACE
-32 C
-26 C
-16 C
-8 C
0C
+8 C
+17 C
+28 C
SURFACE RAIN
HORIZONTAL SCALE 0 1/2 1 MI.
DRAFT VECTOR SCALE 0 15 30 FT/SEC
RAIN
SNOW
ICE CRYSTALS

৩নং চিত্র

বজ্রঝড়ে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে বয়ে আনা বায়ুর পরিমাণ খুবই বেশী । সম্ভবতঃ এ বায়ুর পরিমাণ ঊর্ধ্বদিকে স্থানান্তরিত করা বায়ুর অর্ধেকের মতো । এসব বায়ু যখন ভূ-পৃষ্ঠে আসে তখন এগুলো দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ।

এরূপ বায়ু প্রবাহ কখনও খুব প্রচণ্ড বেগে সংঘটিত হলে ক্ষেত-খামারের বেশ ক্ষতি হয়ে থাকে । নিম্নগামী বায়ুর বহির্মুখী গতির ফলে শস্যাদির চারাগাছ মাটিতে নুইয়ে পড়ে । কিন্তু অধিকাংশ সময়েই স্থানীয় বজ্রঝড়ের ঝড়ো বায়ুর নিম্নগতির বহিরাগমনের ফলে মানুষ খুব গরমের দিনেও কিছুটা স্বস্তি পেয়ে থাকে ।

সবচেয়ে শীতল নিম্নগতিসম্পন্ন বায়ু মেঘের সর্বোচ্চস্তর থেকে নীচে স্থানান্তরিত হয় । বাষ্পীভবনের শীতলতা এসব বায়ুকে পার্শ্ববর্তী বায়ুস্তরের তুলনায় ভারি করে দেয় বলে এ বায়ুগুলো ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম হয় ।

বৈমানিকদের মতে পরিপূর্ণ বজ্রঝড় সবচেয়ে মারাত্মক বস্তু । এসময় বজ্রঝড়ে মেঘের মাঝে বিমান চালনা করতে গেলে বিমানটি কখনও বা খুব উঁচুতে এবং কখনও বা খুব নীচে নেমে যেতে পারে । এসময়ে বৈমানিক কখনও দেখবেন যে তার বিমান প্রতি মিনিটে ১০০০ ফুট নীচে নামছে আবার হয়তো দেখবেন যে বিমানটি প্রতি মিনিটে ২০০০ ফুট উপরে উঠে গেছে । এ ধরনের মেঘের মধ্যে সমস্ত পথ জুড়ে খুব মারাত্মক ধরনের টারবুলেন্স দেখা যায় । পরিণত অবস্থায় এসব মেঘে প্রায়ই বেশ বিজলীপাত পরিলক্ষিত হয় । এ সময় শিলাপাতও দেখা যেতে পারে ।

বিমান চালনার সময় যতদূর সম্ভব সর্বক্ষেত্রেই বজ্রঝড় এড়িয়ে চলা ভাল । কিন্তু বৈমানিককে সর্বদাই পরিণত বজ্রঝড় অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে । আজকালকার বিমান যাত্রীদের জন্য এটা একটা সুখবর যে, বর্তমান যুগের বাণিজ্যিক বিমানগুলো শুধুমাত্র এ কারণেই রাডার যন্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত রাখা হয় । নিম্নগতি যখন মেঘের মাঝে দিয়ে বিস্তৃত হতে থাকে ঊর্ধ্বগতিও তখন ক্রমশঃ ছোট হয়ে পড়ে । এর ফলে বজ্রঝড় নির্মাণকারী শক্তিও কমে যেতে থাকে । পরিণত অবস্থায় বজ্রঝড় সাধারণতঃ ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় বিরাজ করে এবং পরে এগুলো ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যায় । বজ্রঝড় তারপর শেষ অবস্থায় উপনীত হয় । এ অবস্থাকে বজ্রঝড়ের নিরসন অবস্থা বলা হয়ে থাকে ।

বজ্রজড়ের নিরসন অবস্থা

বজ্রঝড়ের নিরসন অবস্থা ঠিক কখন শুরু হয় একথা সঠিকভাবে বলা যায় না। একটি মানুষ কখন বুড়ো হতে শুরু করে একথা বলার চেষ্টা করার মতো এটাও কতকটা দুষ্কর ব্যাপার। ৮০ বছর বয়সের একটা মানুষ বুড়ো হয়ে

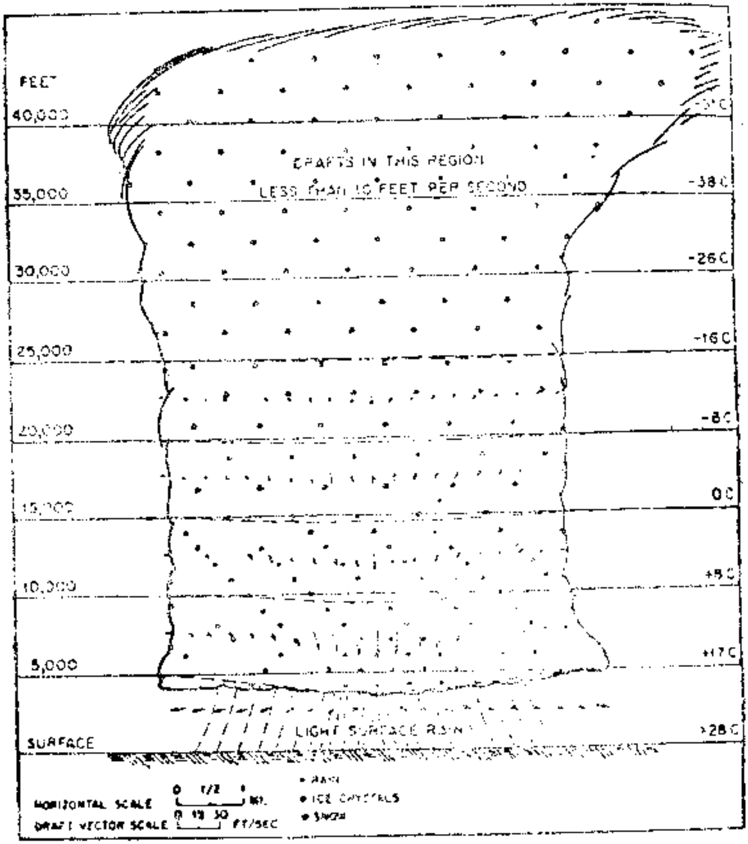
FEET
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
SURFACE
-51 C
-38 C
-26 C
-16 C
-8 C
0 C
+5 C
+17 C
+28 C
DRAFTS IN THIS REGION
LESS THAN 10 FEET PER SECOND
LIGHT SURFACE RAIN
HORIZONTAL SCALE
0 1/2 1 MI.
DRAFT VECTOR SCALE
0 15 30 FT/SEC
RAIN
ICE CRYSTALS
SNOW

৪নং চিত্র

যায় কিন্তু ৫০ বছরের সময় মানুষ বুড়ো হওয়ার পথে বলে মনে করা যেতে পারে। বজ্রঝড়ের নিরসন অবস্থা তখনই হয় যখন এর নিম্নগতির পরিমাণ অর্ধেকেরও বেশী হয়ে পড়ে। এ সময় হয়তোবা এতে বেশ দু একটা বড় রকমের

দমকা হাওয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে যার ফলে যে-কোন বিমানে কিছুটা ঝাঁকুনিও লাগতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ স্থানেই তখন মেঘের শক্তি বেশ শ্লথ হয়ে যায় (৪নং চিত্র দেখুন)।

এ অবস্থায় বায়ুর নিম্নগতির হার ক্রমশঃ কমে যায়। এরপর শুধুমাত্র কতকগুলো দুর্বল রকমের টারবুলেন্সের অস্তিত্ব থাকে। বৃষ্টির পরিমাণও তখন বেশ কমে যায়। অবশেষে বড় বড় জলবিন্দু মেঘের চেয়েও আগে নীচে পড়তে শুরু করে। এ সময় শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি নীচে পড়তে পারে। কখনও বা এ থেকে হাল্কা বৃষ্টিও হতে পারে (drizzle)। মেঘ যখন একটা শেষ সীমায় উপণীত হয় তখন তার আকৃতিরও বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। এ অবস্থায় মেঘের রঙ ধূসর আকার ধারণ করে এবং এগুলো কয়েকটা স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গলনাঙ্কের উপরের অংশের মেঘে শুধুমাত্র বরফের স্ফটিক থাকে। নীচের অংশে শুধু জলবিন্দু থাকে। মাত্র দশ মিনিটের কিছু বেশী সময়ের মধ্যেই চারদিকের মেঘগুলো ক্রমশঃ জলীয়বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। খুব শীঘ্রই এসব মেঘ আর চোখে দেখা যায় না। কারণ এর সমস্ত জলবিন্দু বাষ্পে পরিণত হয় এবং অন্যান্য অংশ বাতাসে অন্যদিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

একটি দীর্ঘজীবী ঝড়

এতক্ষণ আমরা যে-সব বিষয় আলোচনা করলাম সেগুলো সব "এক কোষবিশিষ্ট" স্থানীয় বজ্রঝড়ের জীবন-প্রণালী মাত্র। এ ধরনের ঝড়ের ব্যাস হয় কয়েক মাইল স্থান জুড়ে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ধরনের ঝড় মাত্র এক ঘণ্টা বা তার চেয়েও কম সময় পর্যন্ত আকাশে বিরাজ করে থাকে। এধরনের স্বল্পজীবী ঝড় খুব একটা বিরল ব্যাপার নয়। অনেক সময় বজ্রঝড় কিন্তু বেশ সময় ধরে আকাশে থাকে। বহু ঝড়ের সমষ্টির ফলে এটা সম্ভবপর হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম ঝড়টি বিলিন হয়ে যাওয়ার সময়ের মধ্যেই আর একটা নতুন মেঘ গঠিত হতে শুরু করে। অনেকগুলো মেঘ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়ও বিরাজ করতে পারে। বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণ যন্ত্র ছাড়া একটি মেঘকে অন্যটি

থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে শুধুমাত্র একটি বজ্রঝড় বহু সময় ধরে আকাশে বিরাজ করছে।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে কতগুলো বজ্রঝড় সোজা ও স্বল্পমেয়াদী নিয়মমত অল্পক্ষণ পরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার কতগুলো ঝড় বেশ সময় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বিরাজ করতে থাকে। এর কারণ কি—এ কথাটি আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। বায়ুর জলীয়বাষ্পের পরিমাণের সঙ্গে বাতাসের নানা অবস্থা ও বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতার কিছু যোগসূত্র আছে বলে কতগুলো প্রমাণ পাওয়া গেছে। যোগসূত্রগুলো কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়।

সুসংবদ্ধভাবে গঠিত সারিবদ্ধ বজ্রঝড় বা কয়েকটি বজ্রঝড়ের সমষ্টি থেকে যে দুর্বার আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাতাসই সবচেয়ে বড় স্থান অধিকার করে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে এসব মারাত্মক বজ্রঝড় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

BANSDOC Library

চতুর্থ অধ্যায়

সারিবদ্ধ ঝড় ও মারাত্মক বজ্রঝড়

বজ্রঝড় আসতে দেখে বিপদ আসছে বলে মনে না হয়ে বেশীর ভাগ সময়ই এটাকে একটা আনন্দের খবর বলেই মনে করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্থানেই এসব বজ্রঝড় থেকে সৃষ্ট বৃষ্টির জল ফসল এবং পৌর-সভার জল সরবরাহের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বহন করে আসছে। সাধারণতঃ গরম আবহাওয়ায় বজ্রঝড় সংঘটিত হয় বলে ঊর্ধ্বস্তরের ঠাণ্ডা বায়ু নীচে আসার জন্য আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্তনটি খুবই আরামপ্রদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কখনও বা এধরনের বজ্রঝড় বিশ্বাসঘাতক অথিতির মতো দাঁড়াতে পারে। অঢেল বৃষ্টির পরিবর্তে এসব ঝড় থেকে কোন কোন সময় চাঞ্চল্যময় গোলাগুলীর মত বড় বড় বরফের বলের মত শিলা-বৃষ্টি হতে দেখা যেয়ে থাকে। ৩″ ইঞ্চি আয়তনের শিলাপাতের দ্বারা ক্ষেতের মধ্যে বোমাবর্ষণ করার মতো ফসলের চূড়ান্ত ক্ষতি করে এসব ঝড় কৃষকের প্রকৃত নৈরাশ্যেরও কারণ হতে পারে। ক্যানসাসের গম, ককাসাসের আঙ্গুর এবং ইটালীর ফল প্রায়ই শিলা-বৃষ্টির জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। সংবাদপত্রে আবহাওয়া বিভাগের খবরে আপনি নিম্নরূপ দেখতে পাবেন।

"লানহাম, টেক্সাস, এপ্রিল ৩০, ১৯৫৮,—লানহামের ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে। এখানকার ফসলের ক্ষতি শতকরা ১০০ ভাগের মধ্যে ১০০। শিলাঝড়ের ব্যাস ৩″ ইঞ্চি এবং কতকক্ষেত্রে ৫″ ইঞ্চি। শিলাপাতের সঙ্গে ২০ মিনিট পর্যন্ত ২″ ইঞ্চি বৃষ্টিও হয়েছে। শিলাপাতের পরিমাণ ২ থেকে ৩ ফুট উঁচু বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।"

একটি মারাত্মক বজ্রঝড় থেকে কি পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় অনুমান করুন দেখি? লানহামে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা সত্যি খুব একটা শক্তিশালী ঝড়। এ ঝড়ের জন্য মেঘ সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গমন করতে হয় তা নাগাসাকি শহর ধ্বংসকারী আণবিক বোমার দু'শ গুণেরও অধিক শক্তিশালী।

বড় বড় শিলাখণ্ড ফসলের অনেক ক্ষতি করে সত্য—কিন্তু মারাত্মক বজ্রঝড় তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী ধ্বংসকারী অস্ত্রের ন্যায় কাজ করে থাকে।

বজ্রঝড় যখন ঘরবাড়ি বিনষ্ট করার শক্তি অর্জন করে তখন তাকে "টর্নেডো" বলা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের অবাধ্য (Funnel) অনেক অবিশ্বাস্য ধরনের ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে বিষয়-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়, কিন্তু তার চেয়ে প্রাণহানির সংখ্যা আরও বেশী মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যখন টর্নেডো আসে তখন জীবন রক্ষার জন্য একমাত্র নিশ্চিত স্থান থাকে মাটির নীচে। (৪ নং ও ৫ নং চিত্রে দেখুন।)

ধ্বংসকারী শিলাপাত ও টর্নেডো মারাত্মক বজ্রঝড় ও সাধারণ বজ্রঝড়ের মাঝে একটি সুষ্ঠু পার্থক্যের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। যদিও আবহাওয়াবিদরা আজ পর্যন্ত এ পার্থক্য সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি—তবে এ সমস্যার উত্তর সত্বরই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। কয়েক বছর ধরে বজ্রঝড় বৈজ্ঞানিকদের বেশ কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে রয়েছে। এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করতে হবে।

"কি অবস্থায় এসব বজ্রঝড় গঠিত হয়? সাধারণ ঝড়ের চেয়ে এসব ঝড়ের গঠন-প্রণালী ও জীবনকালের পার্থক্য কি? এগুলোর পূর্বাভাস দেওয়া যায় কি?" "এসব ঝড় প্রতিরোধ করা যায় কি? বজ্রঝড়ের নিজস্ব ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা করার আগে যুক্তরাষ্ট্রে মারাত্মক বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস কিভাবে দেওয়া হয় সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করে দেখা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া সংস্থা থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত খুব মারাত্মক বজ্রঝড়ের কোন পূর্বাভাস প্রকাশ করা হতোনা। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বড় ধরনের শিলাবৃষ্টি ও টর্নেডো গঠনের কারণ নির্ণয় মানুষের জ্ঞানের বাইরে ছিল বলেই ধরে নেয়া হতো। সে সময়ে বিশ্বাস করা হতো যে টর্নেডো বা এ ধরনের মারাত্মক বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস জনসাধারণের মাঝে অযথা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিছু সংখ্যক আবহাওয়াবিদ এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না।

এ অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর দু'জন অফিসার সর্বপ্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীকে

আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়াই ছিল। এ দু'জন আবহাওয়াবিদের অন্যতম কাজ। মেজর ই. জে. ফ-বুস ও ক্যাপ্টেন আর. সি. মিলার তখন ওকলাহোমার টিঙ্কার সামরিক বিমান বন্দরে কার্যরত ছিলেন। ওকলাহোমা এমন একটি অঞ্চল যেখানে প্রায়ই অস্বাভাবিক সংখ্যক টর্নেডোর প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। ১৯৪০ সাল থেকে এঁরা দু'জন টর্নেডো গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণগুলোর উপর কাজ করছিলেন। পূর্বে বর্ণিত তাপ ও জলীয়বাষ্পের বিস্তৃত (distribution) ছাড়াও এঁরা দেখতে পান যে এ ধরনের আবহাওয়ার ১০,০০০ ফুট ও ২০,০০০ ফুট উপরের স্তরে প্রতি মিনিটে ৪০ মাইলের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন এক প্রকার জেট বা ফিনকি বায়ু প্রবাহ বিরাজ করে।

১৯৪৮ সালের ২০শে মার্চ টিঙ্কার বিমান বন্দরের উপর দিয়ে একটি মারাত্মক টর্নেডো বয়ে যায়। তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ১০,০০০,০০০ ডলার মূল্যের বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি হয়। এ ঘটনাটি মেজর ফ. বুস ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে আরও বড় রকমের আলোড়নের সৃষ্টি করে। টর্নেডোর পূর্বাভাস দেবার জন্য এরা বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সাল থেকে এরা টিঙ্কার বিমান বন্দর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মারাত্মক বজ্রঝড়ের পূর্বাভাসের কাজ শুরু করেন। এঁদের মনোবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাভাস পদ্ধতিরও উন্নতি হতে থাকে। পরে এঁরা সমস্ত মধ্য-যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক বজ্রঝড়ের পূর্বাভাসের কাজ শুরু করেন।

মেজর ফ. বুস ও তাঁর সংস্থার এ পূর্বাভাস শুধুমাত্র বিমান বাহিনীর মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ এসব তথ্য সাধারণ মানুষের কাছেও ফাঁস হতে শুরু হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের পূর্বাভাস জনসাধারণের প্রকাশ করার দাবী জোরদার হয়ে উঠে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া সংস্থার কতগুলো পদ্ধতির পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৫২ সালে আবহাওয়া সংস্থা শুধুমাত্র টর্নেডোর খবর জানাবার জন্য পর্যবেক্ষকদের একটি নেট ওয়ার্ক (net work) গঠন করে। টর্নেডো দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মাঝে সতর্কবাণী প্রচার কার্যও শুরু করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন টর্নেডো দেখা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস প্রচার করা হয় না। জনসাধারণের দাবীর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের

আবহাওয়া বিভাগ তাদের কতগুলো আইন-কানুন পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়। আবহাওয়া বিভাগ শুধুমাত্র খবরের কাগজ, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে মারাত্মক বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস দেবার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্থা গঠন করে। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে এ সংস্থার সর্বপ্রথম পূর্বাভাস প্রকাশ করা হয়।

বজ্রঝড় ও মারাত্মক শিলাপাতের পূর্বাভাসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যে ভয়ের কারণ ছিল তার কিছুই সত্য হয়নি। এ ধরনের পূর্বাভাসের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয়ে প্রবেশ করার জন্য ভীড় সৃষ্টি করলো না। জনসাধারণ এ পূর্বাভাসকে একটা মূল্যবান তথ্য হিসেবেই শুধু গ্রহণ করলো। সাধারণ শিক্ষার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ বুঝতে শিখলো যে টর্নেডো খুবই স্বল্পমেয়াদী এবং একটা ছোট্ট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়। পশ্চিম ওকলাহোমার জন্য টর্নেডোর পূর্বাভাস থাকলে সমস্ত এলাকায় টর্নেডো হবে বলে বুঝাবে না। এর অর্থ হল যে এই বিশেষ এলাকায় কয়েকটা ''ফানেল'' মেঘের সৃষ্টি হতে পারে। পূর্বাভাস শুধুমাত্র জনসাধারণকে সে সময় এ ধরনের মেঘের দিকে নজর রাখতে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন একটি বিশেষ ''ফানেল'' (funnel) গঠিত হয় এবং তা আবহাওয়া সংস্থার নজরে আসে তখন সেই বিশেষ স্থানগুলো সম্পর্কে চরম সতর্কবাণী প্রচার করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া সংস্থা থেকে মিজুরির ক্যানসাস সিটি শহরে টর্নেডো ও অন্যান্য প্রচণ্ড আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়ে থাকে। এ সংস্থার বর্তমান অধ্যক্ষের নাম মিঃ ডোনাল্ড হাউস। মারাত্মক বজ্রঝড়ের বর্তমান অনিশ্চয়তা এবং প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের অভাব সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এ সংস্থা বেশ ভালভাবে কাজ করে চলেছে। গত আঠার বছরের মধ্যে এখান থেকে প্রকাশিত সতর্কবাণীর ফলে বহু জীবন রক্ষা হয়েছে। তবু সবাই একবাক্যে বলবে যে এখনও এর উন্নতির জন্য আরও বহুকিছু করা দরকার।

সারিবদ্ধ বজ্রঝড়

কোন ক্ষেত্রে কতকগুলো বজ্রঝড় ১০ মাইল থেকে ১০০ মাইল স্থান জুড়ে সারিবদ্ধভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত হয় কেন? এর জন্য

দুটো সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। আমরা পুর্বেই লক্ষ্য করেছি যে বজ্রঝড় গঠিত হওয়ার জন্য বায়ুতে জলীয়বাষ্প ও অস্থিতিশীলতা থাকতে হয়। বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ও অস্থিতিশীলতা কখনও কখনও একটা সরু "বারান্দার" (corridor) মতো স্থান জুড়ে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সূর্য দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হলে সঠিক অবস্থা সম্পন্ন বিশেষ বায়ু স্তরের মধ্যে পরিচলন মেঘের সূচনা হয়। এ অবস্থা থেকেই সারিবদ্ধ ঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে। (৫নং চিত্র দেখুন।)

৫নং চিত্র

কখনও-বা জলীয় বাষ্পপূর্ণ অস্থিতিশীল বায়ু বহু স্থান জুড়ে পরিবেষ্টিত হলেও বজ্রঝড় শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সারিতে গঠিত হতে শুরু করে। এ ধরনের অবস্থা দেখলে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন—এসব বজ্রঝড় তথাকথিত বায়ুমণ্ডলীয় বিপর্যয় থেকেই গঠিত হয়েছে। এই বিশেষ অঞ্চলের কোন স্থান দিয়ে কোন কিছু প্রবাহিত হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে এক প্রকার সারি সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বায়ুর ঊর্ধ্ব উন্নয়ন গতির সৃষ্টি হতে পারে। ঊর্ধ্বে উত্থিত বায়ুর জন্য পরিচলন মেঘ ও বজ্রঝড়ের সূচনা হয়। নানা ধরনের বিপর্যয়ের ফলেও

এরূপ হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত অবস্থার নাম হল 'ঠাণ্ডা বায়ুর মিশ্রণ' (cold front line)।

উত্তর থেকে খুব বড় আয়তনের ঠাণ্ডা বায়ু যখন দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তখন এগুলো তার গতি পথের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ুগুলো দু'ধারে সরিয়ে দিতে থাকে। ঠাণ্ডা বায়ুগুলো এক প্রকার সীমারেখার সৃষ্টি করে গরম বাতাসগুলোকে নীচের দিকে কেটে দিয়ে উপরে উঠতে বাধ্য করে। ঠাণ্ডা বাতাস গরম বাতাসের চেয়ে ভারি বলে এ সময় দু'ধরনের বাতাসের কিছুটা মিশ্রণ ও সংঘটিত হয়। তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে আবহাওয়ার মানচিত্রে এরূপ সীমারেখা সহজেই নির্ণয় করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এগুলো সম্পর্কে সাধনা করে বৈজ্ঞানিকরা এর নাম দিয়েছিলেন "front"। দুটো বিপক্ষ দলীয় সৈন্য শিবিরের মধ্যে অবস্থিত স্থানের তুলনা করে এর নাম দেওয়া হয় ফ্রন্ট।

ঊর্ধ্বগামী উষ্ণবায়ু যদি যথেষ্ট জলীয়বাষ্পে পূর্ণ ও অস্থিতিশীল হয় তাহলে ফ্রন্টের সান্নিতে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হবে। কখনও কখনও ফ্রন্ট না থাকলেও বায়ুর পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে কোন একটি বিশেষ স্থান জুড়ে বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহের সূচনা হয়। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বাতাস যখন অন্য অঞ্চলের বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হতে থাকে শুধু তখনই এ অবস্থার সূচনা হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠ যখন নিম্নগতি প্রতিরোধ করে তখন বায়ু উপরে উঠতে শুরু করে। এ ধরনের জোর করে উঠানো বায়ুর প্রতিক্রিয়া ঠাণ্ডা ফ্রন্টের দ্বারা উত্থিত বায়ুর মতো একই ধরনের কাজ করে থাকে।

বজ্রঝড়ের সারি গঠিত হলে সেগুলো নিজস্ব শক্তি বলে ছড়িয়ে পরে। কিভাবে এসব সংগঠিত হয় তা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে। সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলের কি ধরনের অবস্থায় সারিবদ্ধ বজ্রঝড় ও মারাত্মক বজ্রঝড় গঠিত হতে পারে সে বিষয়ে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করে নেওয়া যাক।

মারাত্মক বজ্রঝড়ের পরিণত অবস্থা

প্রায় বিশ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে আবহাওয়া সংস্থায় দুজন বৈজ্ঞানিক আলবার্ট কে সো ওয়াণ্টার এবং জে. আর. কাকস মারাত্মক বজ্রঝড় গঠনের

উপযোগী বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা পরিচালনা করেন। এরা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে এসব অবস্থায় প্রায়ই ভূ-পৃষ্ঠের খুব নিকটের স্তরের বায়ু বেশ জলীয়বাষ্পে পূর্ণ থাকে এবং তখন উপরের স্তরের পুরু ও শুষ্ক বায়ু দেখা যেয়ে থাকে। সীমারেখা আবার খুবই ছোট হয়ে থাকে। এ দুরকমের বায়ুর এ অবস্থায় উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার তারতম্য বেশ প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। (৭নং চিত্রে দেখান হয়েছে।) চিত্রে দেখতে পাবেন যে সবচেয়ে নীচের জলীয়বাষ্প পূর্ণ স্তরে তাপমাত্রা উচ্চতার সঙ্গে "B" স্তর পর্যন্ত কমতে থাকে।

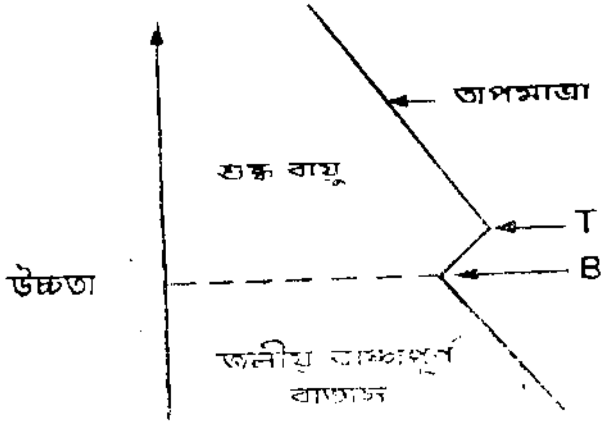

৩নং চিত্র

[মারাত্মক বজ্রঝড় গঠনের সময় উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তন। নীচের স্তরের জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু উপরের গভীর স্তরের শুষ্ক বায়ু থেকে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি স্তর দিয়ে পৃথক করতে দেখা যাচ্ছে। এ স্তরটিকে তাপমাত্রার উল্টো অবস্থা বলা হয়ে থাকে।]

"T" স্তরের উপরের বায়ুমণ্ডলে উচ্চতার সঙ্গে পরিবর্তনের হার প্রায় একই রকম থাকে। "B" ও "T"-এর মাঝে তাপমাত্রা অবশ্য খুব দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই স্তরটিকে উল্টো তাপমাত্রার স্তর বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এ অবস্থায় উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস হবার কথা অথচ তা না হয়ে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে শুরু করে।

তাপমাত্রার উল্টো অবস্থাটি সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের অতি স্থিতিশীল স্তরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী জলীয়বাষ্প পূর্ণ

বায়ুর উপরের দিকে এ স্তর কতকটা ঢাকনার মতো কাজ করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত উল্টো তাপমাত্রা বিরাজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত নীচে থেকে ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ উপরে সঞ্চারিত হতে পারে না। এর ফলে জলীয়বাষ্পপূর্ণ স্তর ক্রমে উষ্ণ হতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তর থেকে বাষ্পীভবনের ফলে তাপমাত্রার উল্টো অবস্থার জন্য বদ্ধ জলীয়বাষ্পের আয়তন ও বৃদ্ধি পায় এবং ফলে স্তরটি জলীয়বাষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

মধ্য-যুক্তরাষ্ট্রের উপরে পূর্বে বর্ণিত বায়ুর তাপ ও জলীয়বাষ্পের অবস্থার সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরের দক্ষিণা বাতাস ও উপরের স্তরের পশ্চিমা বাতাসের অস্তিত্ব থাকে। দক্ষিণের বাতাস এ অঞ্চলে মেক্সিকো উপসাগর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস বয়ে আনে। উপরের বায়ু রকি পর্বতমালা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস পূর্ব দিকে বয়ে নিয়ে যায়।

মারাত্মক বজ্রঝড় গঠিত হবার সময় এ দুটো ভিন্নমুখী বায়ুপ্রবাহ কোন প্রশস্ত পথে তাদের নির্দিষ্ট গতিতে প্রবাহিত হয় না। এ সময় এ দুটো বায়ুপ্রবাহ একটি বেশ শক্তিশালী অথচ সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। সারিবদ্ধ বজ্রঝড় ও মারাত্মক বজ্রঝড় গঠনের ব্যাপারে এ ধরনের বায়ু প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা শুধুমাত্র ঝড় গঠনের কাজ ছাড়াও ঝড় সংরক্ষণ ও বিস্তৃতির কাজও সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্থানীয় বজ্রঝড় গঠনের বিষয় আলোচনা করার সময় আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে এ জন্য বায়ুমণ্ডলে বেশ উঁচু স্তর পর্যন্ত জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হতে হয় এবং বায়ুর মাঝে অস্থিতিশীলতা থাকার প্রয়োজন। ৭নং চিত্রের উদাহরণে এসব প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলোর কোন কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণতঃ ভূ-পৃষ্ঠের ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ ফুট উচ্চতায় তাপমাত্রা হ্রাসের উল্টো অবস্থা পরিচলন ক্রিয়ার জন্য একটি স্থায়ী বাধার মত কাজ করে থাকে। তাপমাত্রা হ্রাসের উল্টো অবস্থা যদি খুব দুর্বলও হয় তবু উপরের স্তরের শুষ্ক বায়ু যে-কোন মেঘকে সহজেই বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে পারে। এ ছাড়াও ঊর্ধ্ব ও নিম্নস্তরের ভিন্নমুখী বায়ুর 'jet' প্রবাহ যে-কোন সদ্য উত্থিত মেঘকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এসব কারণে

আপনি হয়তো সন্দেহ করতে পারেন যে ৭নং চিত্রে বর্ণিত অবস্থার বায়ুমণ্ডলে কোন বজ্রঝড় গঠিত হতে পারে না। আপনার এই সন্দেহ আংশিকভাবে সত্য হবে। বায়ুমণ্ডলের এ ধরনের অবস্থা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে তা থেকে কোন বজ্রঝড় গঠিত হতে পারে না। এ ধরনের অবস্থা থেকে বজ্রঝড় এবং বিশেষ করে মারাত্মক বজ্রঝড় তখনই গঠিত হতে পারে যখন ৭নং চিত্রে বর্ণিত বায়ুমণ্ডলের ঐ বিশেষ অবস্থাটি ক্রমে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সে অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরকের মত একটি দ্রুত অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হতে পারে। যখন 'cold front' বা অন্য কোন ধরনের আবহাওয়ার গোলযোগের ফলে বায়ু উপরে উঠতে শুরু করে তখন তাপমাত্রা হ্রাসের উল্টো অবস্থা সত্বরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থার বায়ুর উর্ধ্বগতি ৫০০০ ফুট থেকে ৫০ ০ ফুট পর্যন্ত হলেই বেশী মনে হবে। খুব দ্রুতগামী 'cold front'-এর সময় আধ ঘন্টার কম সময়ের মধ্যেও এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

"তাপমাত্রা হ্রাসের উল্টো অবস্থা" খুব শিঘ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় কারণ এর চূড়ো তার নীচের দিকের তুলনায় খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। নীচের দিকের জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু জলীয়বাষ্পের জন্য খুব তাড়াতাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এবং ফলে এর পর যখন উপরে উঠতে থাকে তখন তা "moist adiabatic" হারে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। এ তাপের হার হল প্রতি ১০০০ ফুটে ৩·৫° ফাঃ। বায়ুতাপ হ্রাসের হার যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে তখন বায়ুমণ্ডলে বেশ অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

উপরে উত্থিত বায়ু উঁচু স্তরে ও জলীয়বাষ্প ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে এসব বায়ু যে-সব বাইরের বায়ুর সংস্পর্শে আসে সেগুলোর আর্দ্রতা ও বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট হীমতা তখন বেশ কম হয়ে যায় এর ফলে উর্দ্ধগামী ভাসমান বায়ুপ্রবাহের চলনশীল বিস্তারের পথে আর কোন বাধা থাকে না।

পর্যায়ক্রমিকভাবে এখনই বজ্রঝড় গঠনের যে-সব কারণ বর্ণনা করা হল সে-সব বিষয় সম্পর্কে শুধুমাত্র কিছু কিছু সত্যতা যাচাই করা সম্ভবপর হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের দেয়া ৭নং চিত্রে বর্ণিত তাপ ও জলীয় বাষ্পের অবস্থা

সাধারণতঃ মারাত্মক বজ্রঝড়ের দিনের সকালের দিকে দেখা গিয়ে থাকে। যা থেকে টর্নেডো সৃষ্টিকারী বজ্রঝড়ের মাঝে সাধারণতঃ তাপমাত্রার উল্টো অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থার রবার্ট জি. বীব বায়ুমণ্ডলের সময় ও স্থান বিষয়ক দুরূহ গবেষণা পরিচালনা করে দেখেছেন যে টর্নেডো গঠনকারী বজ্রঝড় সৃষ্টির সময় "তাপমাত্রার উল্টো অবস্থার" সৃষ্টি হয় না। এবং এধরনের বজ্রঝড়ের সময় জলীয়বাষ্প খুবই উঁচু স্তর পর্যন্ত উত্থিত হয়ে থাকে।

৭ নম্বর চিত্রে বর্ণিত ব্যাপারটিকে যদিও মারাত্মক বজ্রঝড় গঠনের জন্য একটি বিশেষ পরিপূর্ণ অবস্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে তবুও সব সময়েই এধরনের অবস্থা থাকলেই সাধারণতঃ বজ্রঝড় গঠিত হতে দেখা যায় না। কখনও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় বায়ুমণ্ডল যখন খুব অস্থিতিশীল, বেশ পুরু ও গভীর স্তর পর্যন্ত জলীয়বাষ্পে পূর্ণ থাকে তখনও প্রচণ্ড বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হতে দেখা যেয়ে থাকে।

কখনও কখনও খুব অস্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তরের অতি অল্প আর্দ্রতার মাঝে ও বজ্রঝড় গঠিত হতে দেখা যায়। এত বিসাদৃশ্য অবস্থায় এ ধরনের বজ্রঝড় কেন গঠিত হয় তার কারণ আজও জানা যায়নি। যা হোক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের পার্থক্য বেশ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত বলে হয়তোবা এ ধরনের তারতম্যের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না। মুক্ত বায়ুমণ্ডলে যদি তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নির্ণয়কারী যন্ত্রের মাধ্যমে খুব কাছাকাছি স্থানগুলোর বেশী সংখ্যক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা যেতো তা হলে ঝড় গঠনের পূর্ববর্তী অবস্থার তারতম্যের সংখ্যাগুলো হয়তোবা আরও কমে যেত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেলুন দ্বারা পরিচালিত এসব যন্ত্রপাতির দাম খুব বেশী এগুলো পরিচালনা করাও বেশ ব্যয়সঙ্কুল। এর ফলে বর্তমানে এসব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো সাধারণতঃ ২০০ থেকে ৩০০ মাইল দূরে দূরে অবস্থিত এবং এসমস্ত স্থান থেকে দিনে মাত্র দুবার করে পর্যবেক্ষণকার্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ সময়সূচীর দ্বারা মারাত্মক বজ্রঝড়ের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা গবেষণার কাজ চালাবার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য পাওয়া সম্ভবপর নয়।

সারিবদ্ধ বজ্রঝড়ের সম্প্রসারণ

স্থায়িত্বকালই হল স্থানীয় বজ্রঝড় ও সংগঠনশীল বজ্রঝড়ের মধ্যেকার পার্থক্যগুলোর অন্যতম প্রধান লক্ষণ। বিচ্ছিন্ন বজ্রঝড়গুলো এক থেকে দু ঘণ্টা সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। সারিবদ্ধ বজ্রঝড় বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় পর্যন্ত এমনকি সারাদিন ধরে বিরাজ করতে পারে। এ ধরনের পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অল্প সময়ের জন্য বজ্রঝড়ের গতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেয়া যাক। আপনি যদি একটি বিচ্ছিন্ন বজ্রঝড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করুন—তা হলে দেখতে পারেন যে ১০,০০০ ফুট উচ্চতার বায়ুর গতি পথে এসব ঝড় পরিচালিত হয়ে থাকে।—আবহাওয়াবিদরা একে "steering level" বা বজ্রঝড়ের গতিপথের স্তর বলে অভিহিত করে থাকেন। ঝড়গুলো সাধারণতঃ বাতাসের গতি পথের একটু ডান দিকে চলে—এবং এদের গতি বায়ুর গতির চেয়ে একটু কম হয়ে থাকে। তবুও সাধারণতঃ মেঘের গতি ও বায়ুর গতির (পারস্পরিক সম্পর্ক) অনুবন্ধ বেশ ভালই দেখা যেয়ে থাকে। বজ্রঝড় ও অন্যান্য গবেষণা পরিচালকেরা এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে দেখেছেন। অবশ্য এঁরা একটি বিশেষ মূল্যবান সত্যের প্রমাণ দেখিয়েছেন। প্রতিটি বিক্ষিপ্ত বজ্রঝড় না দেখে যদি আপনি এক সঙ্গে অনেকগুলো বজ্রঝড়ের সমষ্টির গতিপথ অনুসরণ করেন তা হলে এসব বজ্রঝড়গুলোর কেন্দ্রের গতিপথ ১০,০০০ ফুট উচ্চতার বায়ুর গতিপথের চেয়ে বেশ কিছুটা অন্য ধরনের দেখা যাবে। এ ধরনের তারতম্যের কারণ বেশ সহজেই নির্ণয় করা যায়।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে একটি বড় বজ্রঝড় বেশ কয়েকটি বজ্রঝড়ের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। একটি ঝড় যখন লোপ পেতে থাকে তখনই আর একটি নতুন ঝড় উৎপন্ন হতে শুরু করে। সত্যি কথা বলতে গেলে জীবিত অবস্থার যে-কোন একটি বজ্রঝড় এক বা একাধিক সংখ্যক ছোট ছোট নতুন ঝড়ের সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাজগুলো পরিচালনা করতে পারে। পরে এ থেকে আরও অন্যান্য নতুন ঝড়ের সূচনা হয়। এভাবে ঝড় তার আপন অবস্থার মাধ্যমেই সম্প্রসারিত হতে পারে। নতুন অবস্থা থেকে সৃষ্ট ঝড়গুলো সাধারণতঃ

জীবন্ত ঝড়ের সামনে দিয়ে চলতে দেখা যায়। কখন কখন এসব মেঘকে জীবন্ত মেঘের পিছনে বা ধারেও দেখা যেয়ে থাকে। এর ফলে আপনি যদি বজ্রঝড় মালার কেন্দ্রের গতিপথ অনুসরণ করেন তাহলে তা "steering level" বা "ঝড় পরিচালনাকারী বাতাসের" গতির চেয়ে ভিন্ন ধরনের হবে সন্দেহ নেই।

হেনরি. টি. হ্যারিসন ও ডাব্লু. কে. অরেনড্রফ নামক ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের দুজন আবহাওয়াবিদ ১৯৪১ সালের দিকে সর্বপ্রথম বজ্রঝড় সম্প্রসারণের কলাকৌশল সম্পর্কে একটি প্রারম্ভিক ধারণার সূত্রপাত করেন। এরা অনুমান করেন যে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ধাবিত নিম্নগামী বায়ুর অস্তিত্বই বজ্রঝড় সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ।

যদি একটি ফ্রন্ট জুড়ে এক সারি বজ্রঝড়ের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয় তা হলে বায়ুর নিম্নগতির জন্য বায়ুমণ্ডল উচ্চতর স্তর থেকে অসংখ্য ঠাণ্ডা বায়ু ভূমির দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে। ৭নং চিত্রে অঙ্কিত বায়ুর গতি থেকে দেখা যাবে উপরের স্তরের ঠাণ্ডা বায়ু কিছুটা "cold front"-এর ন্যায় কাজ করে থাকে। হ্যারিসন ও অরেনড্রফ এধরনের সীমারেখাকে একটা 'ছোট রকমের ঠাণ্ডা ফ্রন্ট' বলে অভিহিত করেন। বলপূর্বক সামনে এগিয়ে চলার সময় এ সব বায়ুর পার্শ্ববর্তী উষ্ণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ শুষ্ক বায়ুগুলো উপরে উঠতে বাধ্য করে। এ পদ্ধতির জন্য

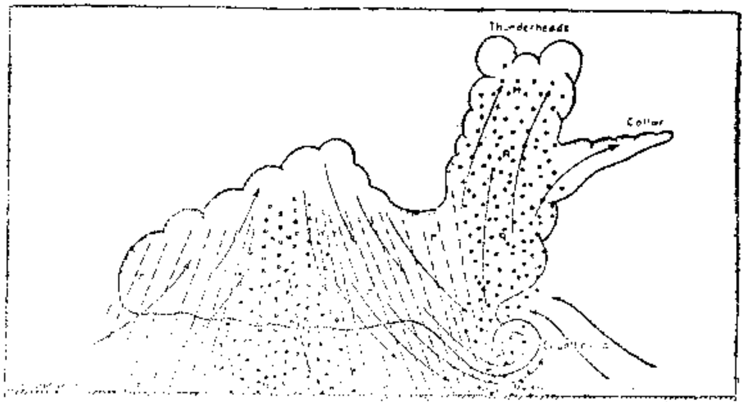

৭নং চিত্র

উষ্ণ ও শুষ্ক জলীয়বাষ্প থেকে অস্থিতিশীলতা নির্গমন ও নতুন বজ্রঝড় সৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে। ঠাণ্ডা বায়ু সাধারণত বড় ধরনের ঠাণ্ডা ফ্রন্টগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী। এর ফলে সারিবদ্ধ বজ্রগুলো ফ্রন্ট থেকে বেশ দূরেও অগ্রসর হতে পারে।

বর্তমানকালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের টেটসুয়া ফুজিটা ঠাণ্ডা বায়ু ছড়ানোর বিভিন্ন ফলাফলগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে গবেষণা করেন। তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে নতুন বজ্রঝড়গুলো সাধারণতঃ ফ্রন্টের সীমারেখার মাঝেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার নির্ভুল সিদ্ধান্তের দ্বারা দেখা যায় যে অনেক বজ্রঝড় গঠিত হওয়ার ফলে এসব গম্বুজাকার মেঘের মাঝে আরও অধিক পরিমাণ ঠাণ্ডাবায়ু প্রবাহিত হয় এবং ফলে এগুলো আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ বড় সারিবদ্ধ বজ্রঝড়ের সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়াটি চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নগামী ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহ আর কোন অস্থিতিশীল জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর সংস্পর্শে না আসে। নিম্নগামী বায়ুর বিস্তৃতির ফলে বজ্রঝড় গঠনের এই বিশেষ থিওরি দ্বারা অনেক সারিবদ্ধ বজ্রঝড়ের সম্প্রসারণের কারণগুলো বেশ সুন্দরভাবে মিলে যায়। কতকগুলো অবস্থায় বিশেষ করে যেখানে উচ্চতার সঙ্গে বায়ুর তারতম্য খুব অল্প সে-সব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে থাকে। যা হোক এ থিওরিতে মারাত্মক বজ্রঝড় গঠনের সময় সবচেয়ে বেশী উচ্চ ও নিম্নস্তরের বায়ু চাপের বিষয়টির উল্লেখ করা হয়নি।

সারিবদ্ধ বজ্রঝড় সম্প্রসারণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থার মরিস টেগারও একটি উন্নতমানের থিওরি বের করেন। মরিসের থিওরিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৭নং চিত্রে বর্ণিত আবহাওয়ার অবস্থার কোন ঠাণ্ডা ফ্রন্টই প্রতিবাহিত হলে তাপমাত্রার উল্টো গতির (তাপমাত্রার inversion) স্তরের মাঝে এক প্রকার ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফ্রন্টের দ্বারা হঠাৎ করে ত্বরণ ও পরে মন্থর গতির সৃষ্টি হতে পারে। জলপ্রবাহ বিষয়ক (hydraulics) ইঞ্জিনিয়াররা প্রমাণ করে দেখেছেন যে একটি নলের মধ্যকার জলের স্তরের মাঝে হঠাৎ করে একটি (piston) দিয়ে ধাক্কা দিলে উপরের স্তরে এক প্রকার দ্রুত উত্থান বা ডেউয়ের সৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রার উল্টো অবস্থায় যদি একটি উত্থানের সৃষ্টি করা যায় তখন তা স্থিতিশীল স্তর দিয়ে উপরে উঠে

যেতে পারে। এর গতি তাপমাত্রার উল্টো অবস্থার উচ্চতা, এবং ঐ স্তরের উপরের ও নীচের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। টেগার উল্লেখ করেছেন যে এসব "উত্থান" (jump) যতই অগ্রসর হয় ততই বায়ু উপরে উঠতে থাকে এবং এর ফলেই বজ্রঝড়ের সূচনা হয়। বজ্রঝড়ের সারি যে সত্যি এভাবে বিস্তৃত হয় সে ধরনের কোন জোড়াল প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি এবং তার ফলে এই বিশেষ "চাপ উত্থানের" থিওরিটি আজও বেশী সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

বায়ু ও বজ্রঝড়

বজ্রঝড় পূর্বাভাস পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই যে বায়ুমণ্ডলের ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় এক প্রকার অতি শক্তিশালী বায়ুর অস্তিত্ব থাকে। বায়ু সাধারণতঃ পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। বহু রকমের মেঘ পর্যবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে এ বিষয়টির কোন মিল নেই। বড় বড় পরিচলন মেঘের চূড়াগুলো প্রায়ই উপরের স্তরের শক্তিশালী বায়ু দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হতে পারে যে উচ্চস্তরের শক্তিশালী বাতাস দীর্ঘস্থায়ী ও বড় ধরনের বজ্রমেঘ গঠন ও বিস্তৃতির পথে বড় রকমের বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আমরা এখন জানি যে এ কথাটি সব সময়ের জন্য সত্য নয়। পরিচলন প্রক্রিয়া যখন খুব দুর্বল হয় এবং ঊর্ধ্বগতি বেশ মন্থর হয়ে পড়ে। তখন উচ্চস্তরের শক্তিশালী বায়ু মেঘের চূড়াগুলোকে কেটে দিতে পারে। এর ফলে বজ্রঝড় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হয়ে যায়।

মারাত্মক বজ্রঝড় পূর্বাভাসকারী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ থাকলেই বজ্রঝড় গঠিত হতে পারে না। ঝড়ের গঠন বৃদ্ধি সাধন ও বিস্তৃতির জন্য উচ্চস্তরের শক্তিশালী বায়ু খুবই প্রয়োজন।

বাতাস পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হলে উচ্চতার সঙ্গে তার গতি বেড়ে যায়। বায়ুমণ্ডলে গঠনশালী অবস্থার একটি বজ্রঝড় সম্পর্কে এখন একটু আলোচনা করা যাক। উচ্চতার সঙ্গে বায়ুর গতি যখন দ্রুত বৃদ্ধি পায় তখন এ ব্যাপারটিকে আমরা শক্তিশালী (vertical wind shear) বলে অভিহিত করে থাকি। ঊর্ধ্বগতি যখন উচ্চস্তরেও বেড়ে যায় তখন বাইরে থেকে এর ভেতরে

DOC Library

বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। ১৫,০০০ ফুট উপরের মেঘের ভিতর যখন বায়ু প্রবেশ করতে থাকে তখন সে উচ্চতায় মেঘের বাইরের বায়ু অনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে। কোন সময় মেঘের মধ্যে নিম্ন মণ্ডলের বায়ুর গতি যখন অল্প থাকে তখন তা উচ্চমণ্ডলীর বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে। নিম্ন মণ্ডলের বায়ু ১৫000 ফুট উচ্চমণ্ডলের বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হলে সেই উচ্চতায় মেঘ ও বাতাসের শক্তির মিশ্রণের ফলে মেঘের গতি বাইরের বায়ুর চেয়েও কম হয়ে যায়। মেঘের আরও উচ্চস্তরেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়।

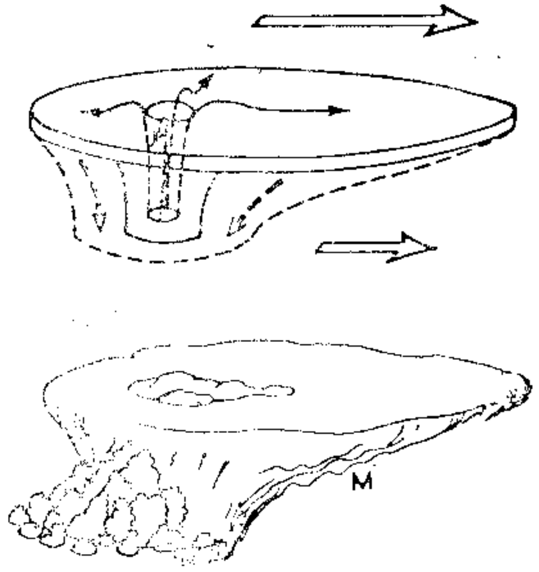

৮নং চিত্র

এ ধরনের মিশ্রণের ফলে উপরের স্তরের বাতাসের তুলনায় মেঘের গতি কম হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে বজ্রঝড় পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক চার্লস ডাব্লু. নিউটন ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জোয়ান স্টার মালকাস একই সঙ্গে এ পদ্ধতি ব্যাখ্যার জন্য একটি গাণিতিক সমীকরণ নির্ণয় করেন।

যখন বায়ুর নিম্নগতির সূচনা হয় তখন মেঘের মধ্যে উপর থেকে বয়ে আনা বায়ুর নীচের স্তরের মেঘের বাইরের বায়ুর চেয়ে অর্ধেক গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বগতির মত এ সময়েও বাইরের বায়ু মেঘের ভিতর প্রবেশ করতে পারে।

বহু কোষবিশিষ্ট বড় বড় বজ্রঝড়ের সময় বাইরের ও ভিতরের বায়ুর গতি ৮নং চিত্রের অনুরূপ হয়ে থাকে।

বজ্রঝড় পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বজ্রঝড় বাতাসের সঙ্গে অগ্রসর হলে যেমনটি হওয়া উচিত রাডায় দিয়ে দেখলে ঠিক তেমনটি দেখা যায় না। রাডার দিয়ে দেখা বজঝড়ে উচ্চতার সঙ্গে "কাত" হয়ে থাকার হার বাতাসে অগ্রসর প্রাপ্ত মেঘের উচ্চতার সঙ্গে "কাত" হয়ে থাকার হারের চেয়ে কম হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে "কাত হয়ে থাকার হার" অথবা সঠিক ভাবে বলতে গেলে "মেঘের shear" "বাতাসের shear"-এর শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ। ৮নং চিত্রে বর্ণিত "বাতাসের sher"-এর সাথে এ ধরনের বায়ুর যথেষ্ট সমন্বয় আছে।

স্পষ্টতঃ মেঘের পিছনের বায়ু মেঘের চেয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় এবং পরে হয় মেঘের ভিতর দিয়ে বা তার চতুর্দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। পরবর্তী গবেষণার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে মেঘের মধ্যে দুই ভাবে বায়ু প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ মেঘের মধ্যে দিয়েই বায়ু প্রবাহিত হতে দেখা যায়। ৮নং চিত্রের—উদাহরণের মধ্যে দুই তীর বিশিষ্ট গতিটি মেঘ ও বায়ুর আপেক্ষিক গতি। এর অর্থ হল এই যে, যদি মেঘটিকে হঠাৎ করে স্থির অবস্থায় নিয়ে আসা যায় তা হলে বায়ু চিত্রে বর্ণিত দুই তীর বিশিষ্ট গতি পথে প্রবাহিত হবে। উদাহরণস্বরূপ মেঘের ভূমির সম্মুখের দিকের মেঘ বাইরের বায়ুর চেয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে থাকে। এর ফলে মেঘ বাইরের বাতাসের আগে চলে যায়। মেঘের আপেক্ষিক গতির ফলে বাইরের বায়ু মেঘের দিকে প্রবাহিত হয়।

বর্তমানে কলরেডোর বোলডার শহরে—"national centre or atmosphere research"-এ কার্যরত চেস্টার ডাব্লু. নিউটন অনুমান করেন যে পূর্বে বর্ণিত বায়ুর আপেক্ষিক গতির দ্বারা বড়বড় বজ্রঝড় ও সারিবদ্ধ বজ্রঝড় বিস্তৃত হয়ে থাকে। চিত্রে বর্ণিত বায়ুপ্রবাহের ফলে সামনের দিকের মেঘের ভূমিসংলগ্ন স্থানগুলোতে বায়ুর মিশ্রণ ঘটে থাকে। এর ফলে ভূ-সংলগ্ন বায়ু উপরে উঠতে বাধা হয়। একইভাবে উপরের স্তরের মেঘের সামনের দিকের বায়ু বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থার ফলে পারিপার্শ্বিক বায়ু

BANSDOC Library
Accession No. 18566

ঝড়ের সামনের দিকে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। ভেজা ও অস্থিতিশীল বায়ু থাকলে মেঘ ও পরিষ্কার আবহাওয়ার বায়ুর মাধ্যমে সৃষ্ট ঊর্ধ্ব প্রবাহের ফলে নতুন বজ্রঝড়ের সূচনা হয়।

বড়বড় বজ্রঝড়ের পিছনের দিকে বায়ুর আপেক্ষিক গতি দ্বারা নিম্নস্তরের বায়ু বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে উপরের বায়ুতে মিশ্রণ ঘটে। এ অবস্থায় বাইরের বায়ু নীচে নামতে থাকে এবং তার ফলে নতুন বজ্রঝড় সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হয়ে যায়।

নিউটন তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে বিশদভাবে গবেষণা করে এই থিওরিটি প্রমাণ করেন। নিউটনের স্ত্রী হ্যারিয়েট ও একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ আবহাওয়াবিদ। এঁরা দু'জনে বজ্রঝড়ের বহুদূরমুখী বিস্তারের এ থিওরিটি সম্পর্কে একটা বেশ শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করেন। এঁদের থিওরিটি মোটামুটিভাবে এখানে তুলে ধরা হল। প্রকৃতপক্ষে এঁদের থিওরিটি আমরা যেটুকু বর্ণনা করেছি তার চেয়ে আরও অনেক যুক্তিসম্পন্ন ও বড় ধরনের ব্যাপার। উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নিউটন তাঁর থিওরির জন্য কতগুলো বাস্তবধর্মী উদাহরণ দ্বারা নিম্নস্তরের দক্ষিণা বাতাস ও উচ্চস্তরের পশ্চিমা বাতাসের উল্লেখ করেছেন। মূল কথায়—নিউটনের এ থিওরিটি দিয়ে ঊর্ধ্বগতির বায়ু ও পরিষ্কার আবহাওয়ার বায়ুর মিশ্রণের ফলে বজ্রঝড়ের গঠন প্রণালী বর্ণনা করা সম্ভবপর। এতক্ষণ সারিবদ্ধ বজ্রঝড় বা কতগুলো ক্ষুদ্র বজ্রঝড় সমষ্টির সম্মুখের দিকে নতুন মেঘ গঠন প্রণালীর কথা বর্ণনা করা হল। বায়ুমণ্ডলের পারিপার্শ্বিক বায়ুগুলো ভেজা ও অস্থিতিশীল থাকলে এভাবেই সারিবদ্ধ বজ্রঝড় সম্মুখের দিকে ক্রমশঃ নতুন মেঘের সূচনা করে এগিয়ে যেতে থাকে।

বায়ুর শক্তিশালী “shear’’-এর জন্য মারাত্মক বজ্রঝড় ও বিশেষ করে বড় ধরনের শিলাঝড় গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক এইচ. লাডলাম নামে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ আবহাওয়াবিদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

১৯৬০ সালে লাডমাল প্রস্তাব করেন যে সাধারণ বজ্রঝড় ও মারাত্মক বজ্রঝড় গঠন প্রণালীর মাঝে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে শিলাবৃষ্টি গঠনকারী বজ্রঝড়ের মাঝে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকে। এধরনের দীর্ঘস্থায়ী উর্ধ্বগতির বিরাজ করার জন্য একটি বেশ শক্তিশালী উর্ধ্বগতির প্রয়োজন। লাডলামের মারাত্মক বজ্রঝড়ের মডেলটি নিউটনের দেয়া বিভম্ন স্তরের বায়ু বিতরণ পদ্ধতির মতোই মনে হবে। ৮নং চিত্রে দেখা গেছে যে, মেঘের নীচের দিকের সামনের বায়ু উপরের টাটকা পিছনের বায়ু ও মেঘের আপেক্ষিক গতির তুলনায় মেঘের দিকে এবং মেঘের সামনের দিকের চুড়ায় ও নীচের স্তরের পিছনের দিকের বায়ু মেঘের বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। লাডলাম দেখিয়েছেন যে এ ধরনের অবস্থায় মেঘের মধ্যে ও তার চতুষ্পার্শ্বে বায়ুর গতি ১১নং চিত্রের মতো হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থার জো: আর. ফাকস একই ধরনের একটা বজ্রঝড়ের মডেল তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই প্রবন্ধটি ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এই মডেলটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে এখানে বায়ুর উর্ধ্বগতি কাত হয়ে যাওয়ার লক্ষণটি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়।

পশ্চিমা বাতাসের প্রভাবে যেহেতু বজ্রঝড় পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় তার ফলে নিম্নস্তরের উর্ধ্বগতির যায়গায় সাধারণতঃ বেশী বায়ু সঞ্চালিত হয় এবং তার জন্য উপরের স্তরের ও সামনের দিকের বায়ু মেঘের বাইরে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

এই বিশেষ ধারণাটি সমর্থনের জন্য নানারূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে যেমন এধরনের পদ্ধতি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইত্যাদি। রাডার দিয়ে শিলা সৃষ্টিকারী বজ্রঝড়গুলো বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এসব ঝড়ের গঠন ও আকৃতি ৩০ মিনিট সময়কালের মধ্যে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় না। কতগুলো “নেহাই” (ANUL) ধরনের চুড়াবিশিষ্ট শিলাবৃষ্টি সম্পন্ন মেঘ দশ মাইল বা তার চেয়েও ঢের বেশী স্থান জুড়ে প্রবহমান বায়ুর পিছনের দিকে বিস্তৃত থাকতে পারে। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয় মেঘের চূড়া থেকে ক্রমাগতভাবে বায়ু মেঘের সামনের দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

শিলাবৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া—পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলী লাডলামের এই থিওরিটির পক্ষে বেশ কতকগুলো জোরালো যুক্তির সৃষ্টি করে। বহুক্ষেত্রেই প্রায় বিশ মাইল পর্যন্ত একটি সংকীর্ণ স্থান জুড়ে শিলাবৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কখনও বা এধরনের শিলাবৃষ্টি রেখা এর চেয়েও বেশ লম্বা হয়ে থাকে। এ থেকে

যুক্তি দেখান হয় যে এ ধরনের সংকীর্ণ লম্বা শিলাঝড় সাধারণতঃ মেঘগুলোর "steering level"-এর বাতাসের গতির সঙ্গে প্রবাহিত হওয়ার ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

লাডলামের থিওরির সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তির কারণ হল এই যে তার বজ্রঝড়ের মডেলটি বড় বড় শিলাখণ্ড গঠনের বিশেষ অবস্থাগুলোর ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে যে কয়েক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট শিলাখণ্ড গঠনের জন্য ১০ মিনিট বা তার চেয়েও অনেক বেশী সময়ের জন্য এগুলোকে মেঘের মাঝে থাকতে হয়। এ ছাড়াও এগুলোকে মেঘের অতিশীতল অঞ্চলের বায়ুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে হবে। এক সময়ে বিশ্বাস করা হতো যে শিলাখণ্ডের মাঝে পরিলক্ষিত পরিষ্কার ও অস্বচ্ছ বরফ সৃষ্টির জন্য এধরনের গঠনশীল শিলাখণ্ডগুলোকে "গলনাঙ্কের" স্তরের উপরের ও নীচের দিকে দোদুল্যমান থাকতে হয়। এখন জানা গেছে যে এ ধরনের প্রকল্প সত্য নয়। শিলাখণ্ড যদি প্রথমে মেঘের মধ্যে দিয়ে অনেক পরিমাণ অতিশীতল মেঘবিন্দুর মাঝে প্রবাহিত হয় এবং পরে অল্প পরিমাণ মেঘবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে তা হলেও পরিষ্কার ও অস্বচ্ছ বরফের স্তর গঠিত হতে পারে।

লাডলামের তৈরী মডেলের বজ্রঝড়ের মাঝে গঠনশীল শিলা বেশ কিছু সময় পর্যন্ত মেঘের মধ্যে বিরাজ করে। ১১নং চিত্রে দেখান হয়েছে যে বায়ুর shear-এর ফলে ঊর্ধ্বগতি একটি কাত হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান শিলাগুলো চিত্রে বর্ণিত ভাঙা ভাঙা রেখাটির পথ অনুসরণ করে। এগুলো বায়ুর ঊর্ধ্বগতির দ্বারা উঁচু স্তরের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। এরূপ বায়ু খুবই দুর্বল ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন স্তরে উপনীত হলে মেঘের বাইরে ছোট ছোট শিলার আকারে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কতকগুলো ক্ষেত্রে এসব শিলা আরও শক্তিশালী ঊর্ধ্বগতির প্রভাবে পড়ে একইভাবে পুনরায় আরও উঁচু স্তরে উঠে পড়ে। বড় বড় শিলা (২″ ইঞ্চির চেয়েও অধিক ব্যাসবিশিষ্ট) বেশ কয়েকবার এভাবে উপরে নীচে যাতায়াত করার ফলে বেশ বড় রকমের আয়তনবিশিষ্ট হয়ে ঊর্ধ্বগতি শক্তির বিপরীত দিক দিয়ে নীচে পড়তে শুরু করে। স্পষ্টতঃ খুব বড় রকমের শিলা সৃষ্টির জন্য বেশী পরিমাণ শক্তিশালী ঊর্ধ্বগতির প্রয়োজন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে ২″ ইঞ্চি ব্যাসের শিলার নীচে পড়ার গতি প্রতি মিনিটে

৬০০ ফোঁটার মতো। এ গতির চেয়ে ঊর্ধ্বগতির পরিমাণ অবশ্যই বেশী হতে হবে।

লাডলামের এ থিওরিটি লাডলাম ও আরও অনেক আবহাওয়াবিদ নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এ থিওরি দিয়ে বড় বড় শিলা সৃষ্টিকারী বজ্রঝড়ের অনেকগুলো জানা তথ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মারাত্মক বজ্রঝড়ের গঠন সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করার আগে আর একটি মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি যে ঊর্ধ্বগতির ফলে ভেজা অস্থিতিশীল বায়ু উপরে উঠার জন্য যে শক্তি নির্গত করে সে শক্তিটি পরিচলন শক্তির একমাত্র উৎস স্থল। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখা উচিত যে নিম্নগতির ফলেও শক্তি নির্গমন সম্ভবপর। অস্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলে উচ্চস্তরের বায়ু "অব্যক্ত ভাবে ঠাণ্ডা" (potentially cold) থাকে। বায়ু যখন বাষ্পীভবনের ফলে ঠাণ্ডা হয় তখন সেগুলো তার পার্শ্ববর্তী বায়ুর তুলনায় ভারী হয়ে যায় এবং তার ফলে এসব বায়ু নীচে নামতে শুরু করে। বাষ্পীভবন চলা পর্যন্ত এসব বায়ু নীচে নামতে থাকে। এ অবস্থায় নির্গত শক্তি মেঘের গতি সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এ অধ্যায়ে বর্ণিত মডেলটিতে বজ্রঝড়ের মাঝে উচ্চ স্তরের অব্যক্ত ঠাণ্ডা বায়ু প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। খুব শক্তিশালী বায়ুর shear-এর সময় এ প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। এর ফলে বায়ুর shear থাকলে বজ্রঝড় বেশ ভালভাবে নীচের স্তরে ভেজা ও উষ্ণ বায়ুর সুপ্ত শক্তি এবং উপরের স্তরের ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বায়ুর সুপ্ত শক্তি গ্রহণ করতে পারে।

সার কথায় বলতে গেলে নিম্নে বর্ণিত অবস্থাগুলোর জন্য প্রচণ্ড বজ্রঝড় গঠিত হয়ে থাকে। মেঘ গঠিত হবার আগে এক স্তরের খুব ভেজা বাতাস একটি খুব গভীর স্তর বিশিষ্ট ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বাতাস দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এ দুটো স্তরের বাতাস একটি ক্ষুদ্র "inversion" স্তর দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। এই inversion স্তরের উচ্চতার সঙ্গে বায়ুর তাপ বাড়তে থাকে। এ সমস্ত বায়ু উপরে উঠার ফলে এক প্রকার অস্থিতিশীল বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে পরিচলন মেঘ ও বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়। শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখি বাতাসের shear বিশেষ করে উঁচু স্তরের পশ্চিমা "ফিনকি" (jet) বায়ুর ফলে এসব ঝড় দীর্ঘস্থায়ীভাবে লম্বা পথ ধরে

প্রতিবাহিত হয়ে থাকে। খুব বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা ও বায়ুর shear থাকার জন্য শক্তিশালী কাত হয়ে পড়া উর্ধ্বচাপের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের অবস্থায় খুব বড় ধরনের শিলা খণ্ড গঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও পরিষ্কারভাবে অজ্ঞাত কতকগুলো কারণের জন্যও বড় বড় শিলা সৃষ্টিকারী বজ্রঝড়গুলো থেকে টর্নেডো গঠনের খুবই সন্তোষজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা গিয়ে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

বজ্রঝড়ের অভাবে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানের আবহাওয়া

পূর্বে আমরা বৈমানিকের দৃষ্টিতে বজ্রঝড় দেখেছি। এ ধরনের দৃশ্য খুব একটা প্রীতিকর ব্যাপার নয়। খুব অল্প কিছুদিন আগে এসব ব্যাপার এক প্রকার বড় ধরনের সন্ত্রাসের কারণ বলে পরিগণিত হতো। কিছুদিন আগেও ফুটন্ত মেঘের মাঝ দিয়ে বিমান চালনার পূর্বে যাত্রীদেরকে নীরব প্রার্থনা ও যীশু খ্রীস্টের নাম স্মরণ করতে শোনা যেত। আধুনিক বিজ্ঞান আজকাল আকাশের এই বিরাট সিংহদানবের থাবার হাত থেকে বিমান চালনার নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হয়েছে। এখনকার বৈমানিকরা রাডার যন্ত্রের সাহায্যে অনেক দূর থেকে এসব মেঘ দেখে সহজেই তাঁদের পছন্দমত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যখন সারিবদ্ধ বজ্রঝড়ের মাঝ দিয়ে বিমান চালাতে হয় তখন রাডার যন্ত্রের সাহায্যে বৈমানিকরা সহজেই ঝড়ের মধ্যকার সবচেয়ে নিরাপদ পথটি বেছে নিতে পারেন। জেট বিমান বজ্রঝড়ের ধ্বংসলীলা প্রশমিত করার ব্যাপারে আর একটি বড় পদক্ষেপের সূচনা করে। এসব বিমান প্রায় সব মেঘের চূড়ার উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে। ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ার সময় এসব বিমানকে বজ্রঝড়ের উপর দিয়ে বা ধার দিয়ে ঘুরে যেতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। বহু উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত কোন সারিবদ্ধ বজ্রঝড়ের মাঝ দিয়ে এসব বিমান চলার সময় রাডার থেকে নিরাপদ পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয়।

বিমান বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে বজ্রঝড়ের এখনও বিমান চালনার জন্য একটা বড় ত্রাসের কারণ বলে পরিগণিত হয়। বিমান উড়া বা নীচে নামার সময় বেশ অশান্ত আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। বিমানে ও ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত রাডারের সাহায্যে এ ধরনের অবস্থাতেও বিমান যাত্রার পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় আজকাল এই কম অবস্থাতেই অনুভূত হয়ে থাকে।

আমরা অনেকেই আজকাল বিমানে ভ্রমণ করে থাকি। রাতের বেলায় উজ্জ্বল দীপ্তময় বিজলী চমকানো ভীতিপ্রদ আকাশও আমরা প্রায় দেখে থাকি।

বিমানের হঠাৎ করে নীচে নেমে আসা ও আসন বন্ধনির ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আজকাল এক রকম অতি পরিচিত ব্যাপারের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য এগুলো খুব কম সময়েই দেখা যায়। আকাশ থেকে নীচে বিমান পড়ার অভিজ্ঞতার কথা আজকাল অনেকেই কখনও জানেন নি বা সম্ভবতঃ আর জানবেন না বলেই মনে হয়ে থাকে। যাঁরা জানেন তাঁদের জন্য বজ্রঝড় একটা অন্য ধরনের কুহেলিকা মনে হবে। একটা শান্তিপূর্ণ রোদে ভরা দিনকে হঠাৎ করে বৃষ্টিমুখর শিলাপূর্ণ প্রচণ্ড বাতাস ও ঝড়ের কর্কশ শব্দের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে বজ্রঝড় তার বিশেষত্ব প্রমাণ করে থাকে।

বজ্রঝড়ের পথে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানের অবস্থা কেমন থাকে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করে দেখা যাক্। পরবর্তী অধ্যায়ে বিজলী ও ঝড়ের কতকগুলো গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বজ্রঝড়ের বৃষ্টি

বৃষ্টি তৈরীর জন্য বজ্রঝড় একটা সুন্দর যন্ত্রের মতো কাজ করে থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ থেকে বেশ বড় রকমের বৃষ্টিপাত হতে পারে। এর কারণ উপলব্ধি করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে ভেজা বায়ু উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে সংপৃক্ত (saturation) হয়ে পড়লে মেঘ গঠিত হতে শুরু করে। এ সময়ে বাতাসের মধ্যে ছোট ছোট লবণের অণু বা অন্যান্য ক্ষুদ্র জিনিসের সঙ্গে জলীয়বাষ্পের ঘনীভবন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। উর্ধ্বগতির জন্য বায়ু উপরের স্তরে স্থানান্তরিত হয় এবং তার ফলে এ ব্যবস্থার মধ্যে মেঘ বিন্দু গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্প পাওয়া যায়। বড় মেঘ বিন্দু বা বরফের স্ফটিক গঠিত হওয়ার পর নতুন মেঘবিন্দু বা বরফের স্ফটিকের মিশ্রণের ফলে দ্রুত গতিতে আরও নতুন মেঘ গঠিত হতে থাকে। বেশী উচ্চতায় উন্নীত হলে বজ্রঝড়ের মধ্যকার জল ও বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শক্তিশালী উর্ধ্বগতির সময় জল ও বরফের বিন্দু মাটিতে পড়তে পারে না। এমন কি তখন বড় বড় শিলাখণ্ড পর্যন্ত উপরে উঠতে বা বাতাসে ভাসতে

দেখা যেয়ে থাকে। এর ফলে বজ্রঝড় কতকটা বৃষ্টির গুদাম ঘরের মতো কাজ করে। বরফ ও জলের ভাণ্ডার যখন খুব বড় হয়ে পরে তখন এগুলো উর্ধ্বগতির প্রভাব পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ সময়ে নিম্নগতির সূচনা হয়। বৃষ্টি তখন মাটিতে পড়তে শুরু করে।

বৃষ্টির বিন্দু মাটিতে পড়ার গতি শুধুমাত্র তার আয়তনের উপর নির্ভরশীল নয়। বায়ুর নিম্নগতির শক্তির সঙ্গে এর একটা বেশ বড় ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। পরিষ্কার আকাশে ২″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃষ্টিবিন্দু প্রতি মিনিটে ১,৮০০ ফুট বেগে নীচে পরতে পারে প্রতি মিনিটে ২,০০০ ফুট নিম্নপ্রবাহের প্রভাবে এ ধরনের বৃষ্টিবিন্দুর গতি হবে প্রতি মিনিটে ৩,৮০০ ফুট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১,৮০০ ফুট ও ২,০০০ ফুটের যোগফল। খুব শক্তিশালী নিম্নগতির সময় যদি অনেক সংখ্যক বড় বড় বৃষ্টিখণ্ড থাকে তাহলে বৃষ্টির গতিও বেশ বেড়ে যেতে পারে।

কতগুলো বৃষ্টিপাতের তালিকা থেকে এ সব বিষয় সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা পাওয়া যেতে পারে। নীচের দেওয়া তালিকাটি যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে তৈরী করা হয়েছে। এ তালিকাটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সময়ের সবচেয়ে বেশী আয়তনের বৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা সম্পর্কে পুরোপুরি প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এগুলো যে গ্রহণযোগ্য নয় সে ধরনেরও কোন প্রমাণ নেই।

সময় কাল	স্থান	তারিখ	ইঞ্চিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
১ মিনিট	অপিড ক্যাম্প ক্যালিফোর্নিয়া	৫ই এপ্রিল ১৯২৬	০·৬৫″
৫ মিনিট	পোর্টবেলো পানামা	২৯শে নবেম্বর ১৯১১	২·৫″
১৫ মিনিট	প্লাম্ব পয়েন্ট জামাইকা	১২ই মে ১৯১৬	৮″
৯ ঘণ্টা	ক্যাটস্কিল নিউইয়র্ক	২৬শে জুলাই ১৮১৯	১০″

স্পষ্টতঃ এ তালিকাটিতে কতগুলো ক্ষেত্রে সত্যি খুব আশ্চর্য ধরনের বৃষ্টির পরিমাণ দেখা গিয়ে থাকে। জামাইকার প্লাম্ব পয়েন্টের বৃষ্টির কথাটি

অনুমান করলে মাত্র ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে ১২´´ ইঞ্চি বৃষ্টির ফলে এখানে কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়াতে পারে ?

সম্ভবতঃ একটা বড় বজ্রঝড় থেকেই এই বৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। একসঙ্গে যখন একটার পর একটা ঝড় দ্রুতগতিতে বয়ে যায় তখন কয়েক ঘণ্টা ধরে এ ধরনের বৃষ্টিপাতের কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। উদাহরণ হিসেবে ১৯১১ সালের ১৪ই মে ও ১০ই জুলাই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বাগোইওতে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একসঙ্গে ৪৬´´ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গিয়েছে। ধারাবাহিকভাবে একের পর এক মারাত্মক বজ্রঝড় থেকে সারাদিন ধরে এ রকম বিরাট পরিমাণ বৃষ্টি সংঘটিত হয়।

সৌভাগ্য বশতঃ উপরোক্ত উদাহরণের মতো ভয়াবহ বৃষ্টিপাত সাধারণত খুব কমই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ ধরনের বৃষ্টি যদি প্রায়ই হতো তা হলে পৃথিবীর এসব অঞ্চল কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিশালী না হয়ে কতগুলো অপ্রয়োজনীয় এলাকা বলে পরিগণিত হতো। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে প্রচুর পরিমাণ ভুট্টা, গম ও যব চাষ চলে। এ-সমস্ত কৃষিকার্য প্রথম অবস্থায় বজ্রঝড়ের বৃষ্টির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এসব জমির জন্য নিয়মিতভাবে মধ্যম ধরনের বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিততাবে ১´´ ইঞ্চি বৃষ্টি এসব ফসলের জন্য খুবই ভাল কাজ করে থাকে। কিন্তু প্রায়ই নিয়মিতভাবে এ রকম বৃষ্টি হয় না। এ অঞ্চলের গ্রীষ্মকালের গড় বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় একই রকম। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেণ্ট লুইস ও মিজবিরতে জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১০·৫´´ অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহের গড় হল ৮´´ ইঞ্চি অথচ কোন কোন বছর যখন খুব বৃষ্টিবাহী ঝড় হয় তখন এসব অঞ্চলে জমিতে বন্যার ফলে কোটি কোটি ডলারের ফসল বিনষ্ট হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলো বিশেষ বজ্রঝড়ের সময় প্রথম বারিবিন্দু মাটিতে পড়ার কয়েক মিনিট কালের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত মাটিতে পড়তে দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের গতি প্রথম ৫ থেকে ১৫ মিনিট সময় পর্যন্ত খুব বেশী হয় এবং পরে আস্তে আস্তে একেবারেই কমে যায়। গড়ে একটি ঝড়ের বৃষ্টি ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরাজ করে।

অবশ্য যখন এক সঙ্গে একই যায়গা দিয়ে অনেকগুলো ঝড় বয়ে যায় তখন অনেকগুলো ভারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাল্কা বৃষ্টি দেখা গিয়ে থাকে।

সঙ্ঘবদ্ধ বজ্রঝড়ের সারি একই স্থান দিয়ে পরিণত বজ্রঝড় নিয়ে প্রবাহিত হলে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক বৃষ্টিপাত ও বন্যা দেখা দিয়ে থাকে।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে মেঘের মাঝে জল ও বরফের অণু বৃদ্ধি পেলে নিম্নগতি প্রবল হয়ে যায় এবং তাহলে সেখানে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নগতি বজ্রঝড়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার; এর ফলে বৃষ্টির আগে উপর থেকে ঠাণ্ডা বায়ু **নীচে** প্রবাহিত হয়ে থাকে।

ঝড়ের আগের দমকা হাওয়া

বজ্রঝড় চলার সময় মেঘের নীচের বাতাসের মধ্যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ঝড় গঠনের প্রারম্ভিক অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুগুলো মেঘের দিকে এককেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এ সময় বায়ুর এককেন্দ্রিকতার পরিমাণ সাধারণতঃ খুব কম হয়। খুব সুগ্রাহি যন্ত্রদ্বারা এগুলো মাপা সম্ভবপর নয়। মেপে দেখা গেছে যে, অতি সক্রিয় পরিচলন মেঘের ৬ থেকে ৮ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট স্থানে জুড়ে বায়ুর গতি পরিবর্তিত হয় এবং এই সমস্ত স্থানে মেঘের ভূমিতে বায়ুপ্রবাহ চলতে থাকে। ঝড়ের সামনের বায়ু যদি হাল্কা হয় তাহলে এক কেন্দ্রিকতার জন্য এসময়কার বায়ু প্রায় স্থির হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক বায়ু স্থির হয়ে গেলে জলীয়বাষ্পের আর্দ্রতার জন্য মানুষ অস্থির বোধ করে থাকে। এ সময় একটা নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য নতুন পরিবেশের সূচনা হয়।

বায়ুর নিম্নগতি এই আকস্মিক রূপান্তরের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। নিম্নমুখি ঠাণ্ডা বায়ু যখন ভূমি স্পর্শ করে তখন তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেশীর ভাগ সময়ে এ সমস্ত বাতাস উপরের স্তরের বায়ুর মতো একই দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। নিম্নগতি চলার সময় গম্বুজের মতো

দ্রুত বৃদ্ধিশীল ঠাণ্ডা বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি সংকীর্ণ সীমারেখা দ্বারা মেঘের চারদিকের অস্থিতিশীল উষ্ণ বায়ু মেঘের উপর থেকে বয়ে আনা ঠাণ্ডা স্থিতিশীল বায়ুর দ্বারা দুটো স্তরের সৃষ্টি করে। এই বিশেষ সীমারেখাটি দুটো ভিন্নমুখি বায়ুকে পৃথক করে রাখে বলে চতুর্থ অধ্যায়ে এ সীমারেখার সম্মুখ প্রান্তটিকে আমরা একটা ছোট রকমের (cold fronts) বলে আখ্যা দিয়েছিলাম। অণুভূমিকভাবে বিস্তৃত হওয়ার সময় উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে এবং তার জন্য নতুন পরিচলন মেঘ ও বজ্রঝড়ের সূচনা হয়।

বায়ুর গতি মাপার জন্য এনোমোমিটার আবিষ্কারের পর থেকেই এ ধরনের ঠাণ্ডা গম্বুজের দমকা হাওয়ার পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইলেরও কম হয়ে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এ পরিমাণটি প্রতি ঘণ্টায় ৪০ মাইলেরও বেশী হয়ে যায়। কখনও বা এগুলো খুবই শক্তিশালী হয়ে বা সামুদ্রিক ঝড়ের (hurricane) গতির মতো ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এরকম অবস্থায় বিষয় সম্পত্তির খুবই ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ে এবং টেলিভিশনের এরিয়াল বিনষ্ট হয়ে থাকে। শস্যের মধে গম, ভুট্টা, সোয়াবিন ইত্যাদি ফসলেরই খুবই ক্ষতি হতে পারে। এরজন্য যুক্তরাষ্ট্রের কতক অঞ্চলে এ ধরনের বজ্রঝড়কে “হাল চালানো বাতাস” বলে অভিহিত করা হয়; স্পষ্টতঃ এ ধরনের ঝড়ের ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে এই বিশেষ নামটির যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে।

১৫ বছর আগে পর্যন্ত এ সমস্ত ঠাণ্ডা গম্বুজের (cold dome) পর্যবেক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। বজ্রঝড় প্রবাহিত হতে পারে এ রকমের কতগুলো সুবিধামত স্থানে এ ধরনের যন্ত্রপাতি বসানো হয়। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন আবহাওয়া সংস্থায় যুগ যুগ ধরে বহু সংখ্যক বায়ু মাপার এনোমোমিটার বায়ু তাপ, চাপ ও আর্দ্রতা মাপার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো। খুব উচ্চমানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি দ্বারা ও ভূমির নিকট বজ্রঝড়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলোর পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। এর প্রধান কারণ হল এই যে এ ধরনের যন্ত্রপাতি দ্বারা শুধুমাত্র আস্তে আস্তে সংঘটিত আবহাওয়ার পর্যায় ক্রমিক বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। আবহাওয়া সংস্থাগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ১২, ২৪ বা ৪৮

ঘণ্টা আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া এবং তার জন্য ধীরে পর্যবেক্ষণমূলক যন্ত্রগুলো দিয়েই এসব কাজ স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করা যায়।

দিনের তাপমাত্রার বৃদ্ধির হার প্রতি ঘণ্টায় ৩° থেকে ৪° ফাঃ এর বেশী হয় না এবং সাধারণতঃ তার চেয়ে বেশ কমই দেখা গিয়ে থাকে। রাতের বেলাতেও একই ধরনের ধীর গতিতে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে। অন্যদিকে বজ্রঝড়ের প্রথম দমকা হাওয়ার সময় মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে বায়ুর তাপ ১০° ফাঃ কমে যেতে পারে।

এক মিনিট সময়ের মধ্যে বায়ুর গতি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ মাইল বেগে বেড়ে যেতে পারে এবং প্রায়ই একই দ্রুতগতিতে ঘণ্টায় এ বায়ুর গতি ২০ থেকে ৩০ মাইল কমে যেতে পারে। এ ধরনের ঠাণ্ডা গম্বুজের (cold dome) ও তার পার্শ্ববর্তী উত্তপ্ত বায়ুর ভাল বর্ণনা পেতে হলে দ্রুত ক্রিয়াশীল recording যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে জী. এ. সার্ফস্টোর্ক নামে একজন বিশিষ্ট জার্মান বৈজ্ঞানিক কতকগুলো ঝড়ের বিশদ বর্ণনা সংগ্রহ করেন। এর পর বজ্রঝড় পরিকল্পনায় আরও বিশদভাবে কতকগুলো পরিমাপক নির্ণয় করা হয়। এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই যে এসব ঝড়েয় সময় ভূ-সন্নিকটবতী স্থানের আবহাওার তিন দিকের অবস্থান ও সময়ের সঙ্গে এগুলোর পরিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করা। শুধুমাত্র কয়েকটি স্থান জুড়ে কাজ করলে এ বিষয়ের কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া সম্ভবপর নয়। এর জন্য একটা বিশেষ এলাকার প্রয়োজন।

১৯৪৬ সালে ফ্লোরিডাতে ৫৫-টি স্থানে প্রতি এক মাইল অন্তর প্রায় ৫ মাইল × ১৫ মাইল স্থান জুড়ে কতকগুলো পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রেই বিশেষ ধরনের বায়ুর গতি, তাপ. চাপ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মাপার যন্ত্র বসানো হয়। পরের বছর ওহিওতে ও একটু পরিবর্তিত ধরনের আর একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। একটি বড় ধরনের এলাকা নিয়ে কাজ করার জন্য ৫৫-টি কেন্দ্রকে এবার ১০ × ২০ মাইল এলাকা জুড়ে মাত্র দু' মাইল পর পর এসব যন্ত্র বসানো হয়।

এসব এলাকার বজ্রঝড় যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় তখন বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে এ অঞ্চলের ভূ-সংলগ্ন স্থানের আবহাওয়া তালিকা বিশদভাবে প্রস্তুত করা সম্ভবপর।

এ ধরনের সমস্ত কেন্দ্রে উচ্চমণ্ডলের তাপ, চাপ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপার জন্য রেডিও সাউণ্ড যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। বেলুন দ্বারা বয়ে নিয়ে যাওয়া এ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে ৫০,০০০ ফুট উচ্চতার এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রাডার ও বিমান চালনোর মাধ্যমে এসব এলাকায় মেঘের বিস্তৃতি বৃদ্ধির পরিমাপ সংগ্রহ করা যায়।

ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানের নানাধরনের পর্যবেক্ষণগুলো বজ্রঝড় পরিকল্পনার অন্যতম বিশ্লেষক হিসেবে পদ্ধতিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়। সমস্ত ঘন ঘন ভূ-সংলগ্ন আবহাওয়া কেন্দ্রগুলোর পর্যবেক্ষণ একত্রে সংগ্রহ করে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলে এ বিশ্লেষণের কাজ সমাপন করেন। এ ব্যাপারে মধ্য-যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থার টেপার ও উইলিয়াম এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুজিটার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকেই এই ঠাণ্ডা গম্বুজের (cold dome) একটা মোটামুটি চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আজকাল এ ধরনের আরও কয়েকটি এলাকা জুড়ে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র খোলা সত্ত্বেও বজ্রঝড় পরিকল্পনায় পাওয়া তথ্যগুলোর অনুসন্ধান কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আজ থেকে ১৫ বছর আগে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার উপর এখনও কাজ চলছে শুনলে আশ্চর্য লাগবে সন্দেহ নেই। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই পর্যবেক্ষণগুলো অস্বাভাবিক রকমের উচ্চ মানের হয়েছিল। এ ছাড়াও এ পরিকল্পনায় পাওয়া পরিমাপকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ৫৫-টি কেন্দ্রে ৪ মাস কাল পর্যন্ত দিন রাত ধরে ৫-টি যন্ত্রের পরিমাপকের সংখ্যা এ পরিকল্পনায় অনেকগুলো ফাইল ভর্তি তথ্যে ভরে যাবে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত তথ্য ও গত যুগের গবেষণা থেকে কি জানা গেছে ?

প্রথমত: গম্বুজের (dome) ঠাণ্ডা বায়ুর পরিমাণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। এ তথ্যটির অর্থ হল এই যে বজ্রঝড়ের নিম্নপ্রবাহের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি কণার বাষ্পীভবন

প্রক্রিয়া চলে ততক্ষণ পর্যন্ত মেঘের নীচে প্রবাহিত বায়ু মেঘের বাইরের বায়ুর চেয়ে ঠাণ্ডা ও ভারী থাকে। এ অবস্থার বায়ু বিস্তৃতিশীল ঠাণ্ডা গম্বুজের (cold dome) উপরের দিকে প্রবাহিত হয়।

বজ্রঝড়ের নীচে থেকে বাইরের দিকে বায়ু বেরিয়ে যাবার পর ঠাণ্ডা বায়ুর স্তর বেশী পুরু হতে পারে না। প্রখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হ্যারল্ড কোশ মিডার ইফারেল টাওয়ারের উপর কতগুলো যন্ত্র বসিয়ে এ সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য জানার জন্য চেষ্টা করেন। যা হোক ৫,০০০ ফুট উঁচু এই Tower-টি থেকে ঠাণ্ডা বায়ুর উপরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছান সম্ভবপর নয়। বেলুন থেকে মাপা পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গেছে যে এ স্তরের চূড়া সাধারণতঃ ২,০০০ থেকে ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উপরে বিস্তৃত থাকে। বজ্রঝড় থেকে এসব ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হলে ঝড়টির সমাপ্তির পর এ ধরনের বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ঠাণ্ডা বায়ুর গম্বুজটি নীচে নেমে যায় এবং ক্রমে সোজা হয়ে পড়ে। যদিও ঠাণ্ডা বায়ু আগমনের সময় ভূ-পৃষ্ঠে হঠাৎ করে বায়ুর স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয় তবুও এ ধরনের বায়ুর গতি ৫০০ থেকে ১০০০ ফুট বেশী উঁচুতে উন্নীত হতে দেখা গিয়ে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের ঘর্ষণের জন্যই এটা সম্ভবপর। ঠাণ্ডা বাতাস খুব দ্রুতগতিতে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার ফলে সব সময় নীচের বায়ু স্তরের গতি ভূ-পৃষ্ঠের পরিখা, গাছ, বিল্ডিং ও অন্যান্য জিনিসের সংস্পর্শে এসে শ্লথ হয়ে যায়। ভূ-পৃষ্ঠের একটু উপরের স্তরের বায়ু এ সমস্ত শক্তিশালী উল্টো স্ফুরণ শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এটা সত্য যে সবচেয়ে নীচের স্তরের বায়ুর গতি শ্লথ হয়ে যাবে। উচ্চতার সাথে বায়ুর গতি দ্রুত বর্ধিত হলে বিমান চালনার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হতো।

খুব অল্প স্থানের মধ্যে বায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হলে এক প্রকার বিশৃঙ্খল ছোট ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের সূচনা হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে জেট বিমানগুলো সাধারণতঃ বেশীর ভাগ বজ্রঝড়ের চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে। এসব বিমান বজ্রঝড়ের মারাত্মক টারবুলেন্সগুলো এড়িয়ে চলতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে জেট বিমানে কখনই টারবুলেন্স অনুভব করা যাবে না। আসলে জেট বিমানের বৈমানিকরা বায়ুমণ্ডলের খুব উঁচু স্তরে

পরিষ্কার আকাশে ও ঝাঁকুনিযুক্ত বায়ু অঞ্চলের সম্মুখীন হয়েছে। স্বচ্ছ বায়ুর টারবুলেন্স (clear air turbulence) সাধারণতঃ যাকে CAT বলে অভিহিত করা হয় তা প্রায়ই হাল্কা ধরনের হয়ে থাকে। কখনও কখনও এসব টারবুলেন্সের ফলে বিমানের মধ্যে ঝাঁকুনিও লাগতে পারে। একটি পরিপূর্ণ বজ্রঝড়ের টারবুলেন্সের তুলনায় এর শক্তি খুবই কম কিন্তু তবুও এটা একটা সমস্যার বিষয় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জানা গেছে খুব শক্তিশালী বাতাসের shear-এর জায়গায় ছোট ছোট বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য CAT সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ঠাণ্ডা গম্বুজের মধ্যে বায়ুর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে উঁচু স্তরের বেশী গতিসম্পন্ন বায়ুর যথেষ্ট মিল রয়েছে। এর ফলে বেশ শক্তিশালী টারবুলেন্স গঠিত হতে পারে। এ অবস্থাটি ভূ-পৃষ্ঠের কাছে সংঘটিত হয় এবং তার জন্য এর ফল খুবই মারাত্মক হতে পারে। অনভিজ্ঞ বৈমানিকের হাতে বিমান থাকলে এ অবস্থায় বিমান নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যেতে পারে। উড়া ও নীচে নামার সময় বিমানের নিয়ন্ত্রণ কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ থেকে একটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে কখনও কোন বিমান বন্দর দিয়ে যদি বড় রকমের দমকা হাওয়া বয়ে যেতে দেখা যায় তা হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিমান নিয়ে উপরে উঠা বা নীচে নামার চেষ্টা করা উচিত নয়।

"ঠাণ্ডা গম্বুজের" (cold dome) সামনের ধারের ঠিক পেছনের দিকের বায়ুর গতি সবচেয়ে বেশী পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা বায়ুর প্রথম দমকা হাওয়া শুরু হওয়ার প্রায় ২০ মিনিট পর এর ধারটি প্রায় ৫ মাইল পর্যন্ত দূরে সরে গিয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে ঠাণ্ডা বায়ুর গতিও বেশ কমে যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দমকা হাওয়ার গতি ২০ মাইলের অনেক বেশীও হতে পারে। এ ধরনের উদাহরণ খুবই বিরল।

কোন স্থানীয় বজ্রঝড় যখন একটি উৎসের মতো কাজ করে তখন তার ঠাণ্ডা বায়ুর গম্বুজটি প্রায় দশ মাইল ব্যাস জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাইরের বায়ুর সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বিলীন হয়ে যায়। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে বজ্রঝড়ের দিনে গরমের

হাত থেকে বেশ কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। এ সমস্ত ঝড় থেকে যে পরিমাণ বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় তা গ্রীষ্মের অত শক্তিশালী রোদ ও গরম হাওয়ার উপর খুব বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

কোন কোন দিন বায়ুর নিম্নগতির ফলে প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত স্থান জুড়ে আবহাওয়ার অবস্থার পবিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে। গুচ্ছ সারিবদ্ধ বজ্রঝড় বা বজ্রঝড়ের সমষ্টি থেকে নিম্নগতির বায়ু প্রবাহিত হলে এ রকম হতে পারে। একই সময়ে যখন বজ্রঝড় যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা বায়ু নির্গমন করে তখন তা থেকে একটা বড় এলাকা জুড়ে ঠাণ্ডা গম্বুজের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের দমকা হাওয়া কোন স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেলে সেখানকার তাপমাত্রা ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে ১০° থেকে ১৫° পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। কয়েক ঘণ্টা সময়কাল পর্যন্ত এ তাপমাত্রা একইভাবে চলতে পারে।

কখনও বা বজ্রঝড়ের নিম্নগতির বায়ু ১০০ মাইলেরও বেশী দূরের অনেক যায়গার বায়ুর গতি, তাপ ও চাপের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ঠাণ্ডা বায়ুর ফল সাধারণতঃ বায়ুর অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়। এ ছাড়াও তাপ ও চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ উপলব্ধি করা যেতে পারে। এসব বিষয় সম্পর্কে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

বজ্রঝড়ের নীচের তাপমাত্রা

আমরা সবাই জানি যে গ্রীষ্মকালে যখন ভূ-পৃষ্ঠে তাপ খুব বেশী থাকে তখন সাধারণতঃ বজ্রঝড় হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি যে বজ্রঝড়ের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাপও উপরের দিকে উন্নীত হয়। আরও আলোচনা করার আগে আমাদের আর একটা কথা জানতে হবে যে বায়ুর অস্থিতিশীলতা থাকলে অর্থাৎ উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তন দ্রুততর হলে ও ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেশ কম থাকলেও পরিচলন মেঘ ও বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে। কখনও কখনও শীতকালেও বজ্রঝড় গঠিত হয়ে থাকে। এসব উদাহরণ সাধারণতঃ খুবই বিরল। ফ্রন্ট বা অন্যান্য আবহাওয়ার গোলযোগের জন্ত

অস্থিতিশীল বায়ু উপরে উঠলে এ ধরনের বজ্রঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। সূর্যকিরণ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ গরম হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের তাপমাত্রা ৮০° ফাঃ-এর উপরে উঠলেই সাধারণতঃ বেশীর ভাগ বজ্রঝড় গঠিত হয়।

অন্যান্য যায়গার তুলনায় যেখানকার তাপমাত্রা বেশী সেখানেই সাধারণতঃ বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে দেখা গেছে যে পাহাড় ও পার্বত্য এলাকায় পাহাড় বা পর্বতের উপরেই সর্বপ্রথম পরিচলন মেঘ বা বজ্রঝড়ের সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। যে সমস্ত এলাকায় প্রাকৃতিক হ্রদ আছে সেখানেও সাধারণতঃ হ্রদের বাইরের শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে সর্বপ্রথম মেঘ গঠিত হয়। ভূমি জলের চেয়ে খুব তাড়াতাড়ি উষ্ণ হয় বলে এটা সম্ভবপর।

মোটামুটিভাবে একই রকমের যায়গার বেলায় ভূ-পৃষ্ঠের গঠন প্রণালীর প্রভাবের গুরুত্ব বেশী ভাল করে বোঝা যায় না। অনেকে প্রস্তাব করেছেন যে ঘাসের জমি ও চাষ করার জমির মধ্যে চাষ করার জমি মেঘ গঠনের জন্য অনুকূল হয়ে থাকে। এ ধরনের ধারণা যুক্তিসঙ্গত হলেও কেউ এখনও সঠিকভাবে এ তথ্যটি প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। বজ্রঝড় পরিকল্পনা থেকে নতুন গঠিত পরিচলন মেঘের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্য নির্ণয় করা আজও সম্ভবপর হয়নি। নিম্ন প্রবাহ শুরু হওয়ার পরে অবশ্য তাপের তারতম্য খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়ে। পরিণত বজ্রঝড় থেকে যে ঠাণ্ডা বায়ু নির্গত হয় তার জন্য তাপমাত্রা খুবই দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

৯নং চিত্রে বজ্রঝড় বয়ে যাওয়ার সময় তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তনের উদাহরণ দেখান হয়েছে।

খুব ঘন আবহাওয়া কেন্দ্র বিশিষ্ট এলাকার মাঝে তাপমাত্রার অবস্থা থেকে বজ্রঝড়ের অবস্থান বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যেতে পারে। ফ্লোরিডা নেটওয়ার্কের তাপমাত্রার অবস্থাটি লক্ষণীয় ব্যাপার। আমরা পূর্বেই বলেছি ফ্লোরিডাতে প্রতি ১ মাইল স্থান পর পর ৫৫-টি আবহাওয়া কেন্দ্র বসানো হয়েছিল। একই সঙ্গে দুটো বিচ্ছিন্ন বজ্রঝড় এ এলাকায় নিম্ন প্রবাহের বায়ু ছড়াতে শুরু করে। ঝড় দুটোর অবস্থান নিম্ন তাপের এলাকা থেকে সহজেই নির্ণয় করা যায়। পশ্চিম ধারের মেঘটি খুব বড় ও সক্রিয় ছিল। এর নিম্নগতি খুব শক্তিশালী ও ঠাণ্ডা। ঠিক এই মেঘটির নীচের তাপমাত্রা ৭১° ফাঃ

এ নেমে যায়। এটা একটু বেশ বড় রকমের তাপ হ্রাস বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। পরে দেখা যায় যে সবচেয়ে দক্ষিণের কেন্দ্রটির তাপমাত্রার প্রায়

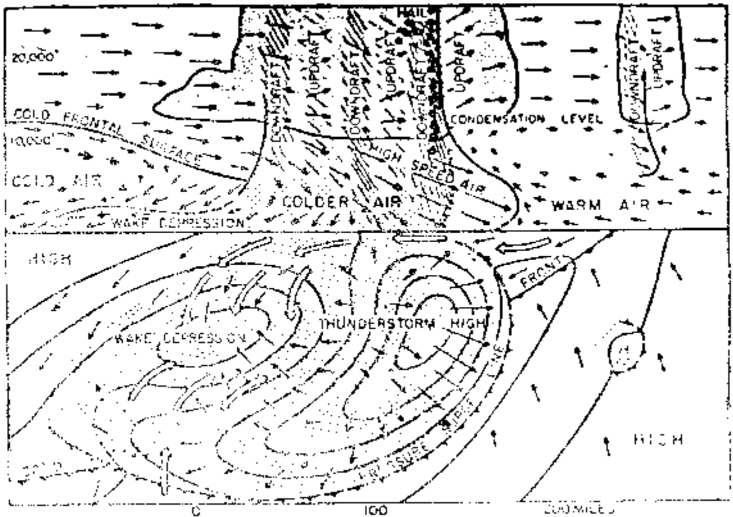
20,000'
10,000'
COLD FRONTAL SURFACE
COLD AIR
WAKE DEPRESSION
DOWNDRAFT
UPDRAFT
HAIL
COLDER AIR
HIGH SPEED AIR
CONDENSATION LEVEL
WARM AIR
HIGH
WAKE DEPRESSION
THUNDERSTORM HIGH
FRONT
PRESSURE SURGE LINE
HIGH
0
100
200 MILES

৯নং চিত্র

৯০° ফাঃ। এটা ঝড় শুরু হওয়ার পূর্বের একটা সাধারণ অবস্থা মাত্র। এই বিশেষ ঝড়টি কমপক্ষে ১৯° ফাঃ তাপমাত্রা হ্রাস করতে সক্ষম হয়।

এই নেটওয়ার্কের পূর্ব দিকের শেষ সীমায় তখনও হয়তো বা বৃষ্টিপাত মোটেই শুরু হয়নি বা খুব কম ছিল। এ অবস্থায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮৪° ফাঃ পরবর্তী ৩০ মিনিটে ঝড়ের আকৃতি বড় হয়ে যায় এবং নিম্নপ্রবাহ আরও শক্তিশালী হয়। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপও কমে যেতে শুরু করে। এর জন্য সর্বন্যূন তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৭৬° ফাঃ-এ।

উপরে বর্ণিত বজ্রঝড়টি ১৯৪৬ সালের ৯ই জুলাই বেলা ১টা ৩০ মিনিটের সময় ফ্লোরিডার সেন্ট ক্লাউন শহরে সংঘটিত হয়। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই হয়তো বা এ ঝড়টিকে স্বাগতমই জানিয়েছিল। ঝড়টি উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ার মাঝে একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই।

বজ্রঝড়ের নীচে চাপের তারতম্য

চাপ কথাটি সবার জন্যই বেশ একটা জানা কথা। এই বিশেষ শব্দটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে এর কিন্তু একটা সঠিক অর্থ আছে। সংজ্ঞা দ্বারা এর অর্থ হল প্রতি একক স্থানের উপর নিয়োজিত শক্তি। বায়ুমণ্ডলের চাপ সম্পর্কে বলা হলে তার অর্থ হয় ঠিক তাই অর্থাৎ প্রতি একক স্থানের উপর নিয়োজিত শক্তি। সমুদ্রের পারে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানের চাপের পরিমাণ ১৪'৭ পাউণ্ড। আপনি পূর্বে কখনও এ ব্যাপারে ভেবে না দেখে থাকলে হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন "এই ১৪'৭ পাউণ্ড শক্তি কোথা থেকে আসে?" সোজা কথায় বল্‌তে গেলে এই ১৪'৭ পাউণ্ড হল সমুদ্রের পারের প্রতি ১ বর্গ ইঞ্চি স্থানের নীচে থেকে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর পর্যন্ত বায়ু সমষ্টির ওজন মাত্র। সবার জন্য সহজে বোধগম্য হবে বলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪'৭ পাউণ্ড এর কথা এখানে উল্লেখ করা হল। আরও নানাভাবে চাপের ব্যাখ্যা করা যায়। প্রায় ৩০'' ইঞ্চি লম্বা এক দিকে বন্ধ একটি খালি নল নিয়ে তাতে পারদ ভরে আর একটা পারদপূর্ণ পাত্রে উল্টো করে ধরলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ পারদ এ নলের বাইরে বেরিয়ে আস্‌ছে। একটা স্বাভাবিক দিনে ঐ নলের পারদের উচ্চতা হবে ২৯'৯২ ইঞ্চি। বায়ুমণ্ডলের চাপ পারদের পাত্রে পড়ার জন্য নলের পারদটিকে উপরে তুলে ধরে এবং তার ফলে নল থেকে পারদ নীচে নামতে পারে না। পারদপূর্ণ নলের উচ্চতা এমন হবে যে ঐ পরিমাণ পারদের ওজন নলের বাইরের পাত্রের বায়ুমণ্ডলের ওজনের ঠিক সমান হবে। ১৬৪৩ সালে টরিসলি সর্বপ্রথম এ পরীক্ষণ কার্যটি পরিচালনা করেন। আধুনিক পারদের চাপমান যন্ত্রগুলো সবই এ বিশেষ মূলতত্ত্ব থেকে গৃহীত হয়েছে। আপনি হয়তো ভাববেন যে নিশ্চয়ই এ ছাড়া অন্যভাবেও চাপ মাপা যেতে পারে। সে কথাও সত্য বটে।

বেতার ও টেলিভিশনে বায়ুমণ্ডলের চাপ সম্পর্কে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর সবই প্রায় প্রতি ইঞ্চি পারদের চাপ মাত্রার আয়তনে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আবহাওয়াবিদরা তাদের সুবিধার জন্য "মিলিবার" নামে চাপের আর এক প্রকার একক ব্যবহার করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ হল ১০১৩২ মিলিবার।

এ পরিমাণটি সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ডের হিসেব থেকে নেওয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে দেখা গেছে যে বায়ুমণ্ডলের চাপ থেকে আবহাওয়া সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অবশ্য এ দিয়ে কখনই একটা সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না বরঞ্চ কখনও কখনও এর জন্য ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের চাপ হ্রাস পেলে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার সম্ভবনা বেশী থাকে এবং ভাল হওয়ার সম্ভবনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কম হয়। আপনি পত্রিকায় প্রকাশিত বা টেলিভিশনে দেখানো আবহাওয়ার মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন যে সাধারণতঃ অল্প চাপবিশিষ্ট এলাকাগুলোতে মেঘ বা বৃষ্টি দেখা যায়। হারিকেন বা সমুদ্র-ঝড়ের সময় খুব কম চাপের সঙ্গে মারাত্মক ধরনের খারাপ আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রচণ্ড ঝড়ে ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুর চাপ খুব বেশী কমে যায়। ফিলিপাইনে এ ধরনের একটি ঝড়ের সময় বায়ুর চাপ ৮৮৭ মিলিবার অর্থাৎ ২১'১৮ ইঞ্চি কমে গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

টর্নেডোর কেন্দ্রভূমির চাপ হয়তো বা হারিকেনের কেন্দ্রের চাপের মতো বা তার চেয়েও বেশী কমে যেতে পারে। এগুলো মাপার জন্য ভাল কোন ব্যবস্থা আজও বের হয়নি। প্রথমতঃ এসব ঝড়ের আয়তন খুবই ছোট অর্থাৎ কখনও এক মাইলেরও কম ব্যাসের হয় এবং তার ফলে চাপমাত্র যন্ত্রবিশিষ্ট এলাকা দিয়ে খুব অল্প সময়েই এসব ঝড় বয়ে যেতে দেখা গিয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ টর্নেডো এত ধ্বংসাত্মক ঝড় যে এটা যেখান দিয়ে বয়ে যায় সেখানকার যন্ত্রপাতি খুব কম সময়েই ভাল অবস্থায় ফেরত পাওয়া যায়।

বজ্রঝড়ের নীচে চাপমাত্রার কথা উচ্চ দ্রাঘিমাঞ্চলের বড় বড় ঝড় টর্নেডোর চাপের ঠিক উল্টো হয়ে থাকে। পরিচলন মেঘ গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রথমতঃ এক মিলিবারের চেয়েও কম চাপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যা হোক সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে, কোন স্থানের উপর দিকে পরিপূর্ণ বজ্রঝড় বয়ে যাওয়ার সময় চাপ না কমে বরঞ্চ বেড়ে গিয়ে থাকে।

কেন এই চাপ বৃদ্ধি পায় একথাটি জানতে হলে কি কারণে চাপ বৃদ্ধি হয় তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা এখানে ধরে নিতে পারি যে

বায়ুমণ্ডলের গভীরতা সাধারণত পরিবর্তিত হয় না। প্রতি একক স্থানের বায়ুর পরিমাণ বেড়ে গেলে বায়ুর ওজনও বেড়ে যায়। বায়ু ঠাণ্ডা ও শুষ্ক হলে তার ওজন উষ্ণ ও ভেজা বায়ুর চেয়ে বেশী হয়।

কিউমুলাস পর্যায়ের বজ্রঝড় গঠনের সময় মেঘের মধ্যকার বায়ু বাইরের বায়ুর তুলনায় গরম ও ভেজা হয়ে থাকে। এর ফলে মেঘের মাঝে দিয়ে যে বায়ুর স্তর উপরে উঠে তা বেশ হাল্কা হয়। এ সময় মেঘের নীচের বায়ুর চাপ বেশ কমে যায়। তরল জলবিন্দুর ওজন চাপ বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করে, কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রা দ্বারা সৃষ্ট চাপের উপর এর প্রভাব খুবই কম হয়।

পরিপূর্ণ অবস্থায় উন্নীত হলে মেঘের মাঝে বেশ পরিমাণ বৃষ্টি ও শক্তিশালী নিম্নগতি সৃষ্টি হতে থাকে। এবং তার ফলে কতগুলো বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নিম্ন প্রবাহের ঠাণ্ডা বায়ু চারদিকের উষ্ণ বায়ুর চেয়ে বেশী ভারী হয় এবং তার ফলে বায়ুর চাপ বেড়ে গিয়ে থাকে। মেঘের নীচের বা চারদিকের ঠাণ্ডা বায়ুর গম্বুজ (dome)-কে তথাকথিত চাপের গম্বুজ বলে অভিহিত করা হয়। ব্যারোগ্রাফ নামক এক প্রকার চাপমান যন্ত্রের বক্ররেখাপূর্ণ রেকর্ড থেকেই এ নামের সূচনা হয়। এই বক্ররেখাটি খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা বায়ু অঞ্চলের আয়তনের উপর নির্ভরশীল অবস্থায় ৩০ মিনিট থেকে শুরু করে বহু ঘণ্টা সময় পর্যন্ত এভাবে বায়ুর তাপ বেড়ে যেতে পারে।

সারিবদ্ধ বজ্রঝড় থেকে কোন বড় গম্বুজ (dome)-এর সৃষ্টি হলে একই সঙ্গে বেশ কয়েক জায়গায় চাপ বেড়ে যেতে পারে। মাত্র দুই মিনিট সময়ের মধ্যে ৬ মিলিবার চাপ বৃদ্ধির ও খবর পাওয়া যায়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে মরিস ট্যাপার বায়ুমণ্ডলের ঢেউ দিয়ে "হঠাৎ চাপ বৃদ্ধি" করার কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এসব প্রবহমান ঢেউ থেকেই বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা বজ্রঝড়ের সঙ্গে চাপের তারতম্য নিয়ে সাধনা করেছেন তাঁদের অনেকেই ট্যাপারের এই বিশেষ থিওরিটি সমর্থন করেন না। তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে বজ্রঝড়ের জন্য এ ধরনের "হঠাৎ চাপ বৃদ্ধি" (pressure jump) সংঘটিত হয়ে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে

ঝড় নিজেই উপরের স্তরের ঠাণ্ডা বাতাস নীচে নিয়ে আসে। এবং এসব বাতাস নীচের উষ্ণ বা ভেজা বাতাসের চেয়ে বেশী ওজনের হয় নীচের স্তরের উষ্ণ ও ভেজা বাতাসের জন্যই বজ্রঝড় গঠিত হয়।

বঝজ্রড় পরিকল্পনা থেকে ‘‘চাপের গম্বুজ’’ সম্পর্কে একটা সুন্দর তথ্য প্রকাশিত হয়। পরিপূর্ণ বজ্রঝড়ের নীচের আবহাওয়া কেন্দ্রে ‘‘চাপের গম্বুজ’’ মাথায় একটা সুনির্দিষ্ট কুঁজের সৃষ্টি হয়। এটা যেহেতু পরিপূর্ণ বজ্রঝড়ের ঠিক নীচে সংঘটিত হয় সেই জন্যই এই ‘‘চাপের নাসিকা’’-টিকে নিম্নপ্রবাহের বায়ুর ঊর্ধ্বগতির ফল বলে মনে করা হয়ে থাকে। যা হোক এর প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি।

কোন সময় বিশ্বাস করা হতো যে চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে বজ্রঝড় আসার সম্ভাবনা আছে বলে হয়তো বা এ তথ্যটি দিয়ে। ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়াও সম্ভবপর হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ধরনের চাপ বৃদ্ধি ও বজ্রঝড় আসার সময়ের পার্থক্য এত কম যে এ দিয়ে পূর্বাভাস দেয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। রাডার দিয়ে আরও সুষ্ঠুভাবে এ কাজটি পরিচালনা করা যায়। এ দিয়ে বহু মাইল দূরের ঝড় দেখা যায় এবং সে-সব ঝড়ের গতিও নির্ণয় করা যায়।

সারমর্ম

ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়া থেকে বজ্রঝড়ের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের অবস্থা অনুমান করা যায়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেও বায়ু ও চাপের ক্ষুদ্র পরিবর্তন দ্বারা ঊর্ধ্বগামী বায়ুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর। ঝড় পরিপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে বৃষ্টি আরম্ভ হলে বায়ুর গতি তাপ ও চাপের বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়। এর ফলে উপরের স্তর থেকে বেশ পরিমাণ ঠাণ্ডা বায়ু ভূ-পৃষ্ঠে উপনীত হয়। বজ্রঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়ার পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের তাপ উপরে স্থানান্তরিত হয়ে আবহাওয়া আরও স্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিজলী ও বজ্রপাত

পরিপূর্ণ অবস্থায় একটি বড় আকারের বজ্রঝড় দেখতে বেশ সুন্দর দেখায়। লোহার তৈরী খুঁটির মতো এসব ঝড় ঊর্ধ্ব আকাশে বিস্তৃত হয়ে থাকে। এ ধরনের ঝড়ের উপরিভাগে এক প্রকার সাদা ঝিল্লির মতো টুপি দেখা যায়। সাধারণতঃ বজ্রমেঘের ভূমি থেকে বৃষ্টি বা শিলা নীচে পড়া শুরু করলে এ ধরনের বৃষ্টি বা শিলাপাতের সঙ্গে বেশ বড় ধরনের দমকা হাওয়ার সৃষ্টি হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ধূলোবালি ও গাছের পাতা তচনচ হয়ে যায়। এই বিশেষ ঝড়ের সর্ব শেষ ও সর্ব প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব হল বিজলী ও বজ্রপাত।

হাজার হাজার বছর ধরে বিজলীপাত মানুষের জন্য ভীতি ও সন্ত্রাসের কারণ হয়ে এসেছে। আকাশ থেকে এসব বিজলী সেকালে গাছ বা বাড়ির মাঝে অগ্নিপাতের সূচনা করত। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তু প্রায়ই এর দাপটে প্রাণ হারায়। এ জন্য বিজলীপাতকে মানুষ—স্বাভাবিক ভাবেই বিধাতার দেওয়া একটা বিশেষ অস্ত্র বলে মনে করে থাকত। ভালভাবে ভাবলে এখনও এরূপ মনোভাবের জন্য কোন বিস্ময় প্রকাশ করা যুক্তিসম্পন্ন হবে না।

সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকরা আকাশ ও আবহাওয়াকে প্রকৃতির অঙ্গ বলে মনে করতেন। দুই হাজার বছর পরে আরও কৌতুহলী একজন বৈজ্ঞানিক বিজলীপাত সম্পর্কে কতগুলো নির্ভুল তথ্য আবিষ্কার করে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিকেরা তড়িৎবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণার কাজ শুরু করেন। তড়িৎশক্তির বৈজ্ঞানিক গুণাবলী খুব তাড়াতাড়ি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়। ১৭০৮ সালের প্রথমভাগে উইলিয়াম ওয়াল নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্থির বিদ্যুৎ ক্ষরণের সময় বিজলীর স্ফুলিঙ্গ ও বজ্রের শব্দের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। এর আরও ৪৫ বছর পর এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তমূলক গবেষণার কাজ পরিচালনা করে

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেন যে বিজলীপাত বৈদ্যুতিক ক্ষরণ থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ কাজগুলো সবই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিশিষ্ট অবদান। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গবেষণা ছিল বজ্রঝড়ের মাঝে ঘুড়ি চালনা। তিনি ঐ পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে মেঘের মধ্যে এক প্রকার বৈদ্যুতিক চার্জের (charge) অস্তিত্ব রয়েছে। রুশ সাহিত্যিকদের মতে রাশিয়াতেও প্রায় একই সময়ে মিখাইল ভি. লমোনোসোফ ও জর্জি ভাব্লিও রিচম্যান নামক দুজন রুশ বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্বে এ ধরনের আর একটি গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক রিচম্যান তাঁর পরীক্ষণ কার্য পরিচালনার সময় বিজলীপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।

ফ্রাঙ্কলিনের গবেষণা ও বজ্রঝড়ের তড়িৎ শক্তি সম্পর্কে তার কতগুলো সিদ্ধান্ত সত্যি বেশ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ফ্রাঙ্কলিনের কাজ শুরু হবার পর থেকে আজ প্রায় ২০০ বছর সময় পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে আমরা বজ্রঝড় ও বিজলী সম্পর্কে আর বহু কিছু জেনেছি। তবুও এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও সঠিকভাবে জানতে পারিনি। এ ব্যাপারে নানামুখি ধারণার কোন অভাব ঘটেনি। আমরা পরে দেখতে পাব যে এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত বহু বিচক্ষণ প্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয় এই যে বজ্রবাহী মেঘেরও চারদিকের বায়ুর বৈদ্যুতিক গুণাবলী মাপার জন্য কোন ভাল যন্ত্র আজও আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়নি।

বজ্রঝড়ের বৈদ্যুতিক গঠনাবলী

বহুদিন ধরে বজ্রঝড়ের বৈদ্যুতিক গঠনাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মনে কতগুলো বড় ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করত। এখন আর এ কথা সত্য নয়। বিভিন্ন মেঘের মাঝে বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ এখনও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না বটে, তবে এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণাগুলো আজকাল বৈজ্ঞানিকদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেঘের মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এগুলো মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু বর্ণনা করা যাক। কতগুলো উপযোগী যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন জলবিন্দু বা বড় আয়তনের বায়ু ও জলবিন্দু সমষ্টির বৈদ্যুতিক চার্জ মাপা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ মেঘের মধ্যে এসব পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা খুবই দুষ্কর। এসব যন্ত্রপাতির জন্য বিমান ব্যবহার করলে বিমান ও বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। ফলে এসব পর্যবেক্ষণ সঠিক হয় না। বেলুনের সঙ্গে এসব যন্ত্র ঝুলিয়ে দিয়ে সার্থকতা অর্জন করা যায় বটে, তবে বেলুনের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থা নেই বলে এসব পরীক্ষণের ফলাফলের মাঝেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিমানের সাহায্যে এ বিষয়ে কতগুলো পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। বেশ কঠিন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় বলে এসব পরীক্ষণ কার্য পরিচালনার সংখ্যা আজ পর্যন্ত খুব বেশী হয়নি।

মেঘের চার্জ সম্পর্কে অনেক তথ্যই মেঘের "বৈদ্যুতিক ফিল্ড" মেপে সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট দুটো বস্তু যখন আলাদাভাবে বিরাজ করে তখন তাদের মাঝে এক প্রকার "বৈদ্যুতিক ফিল্ড" থাকে বৈদ্যুতিক ফিল্ডের শক্তি এ ধরনের চার্জের পরিমাণ ও তাদের দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। বৈদ্যুতিক ফিল্ডের শক্তি মাপার জন্য আজকাল বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি ভূপৃষ্ঠে ও বিমানে ব্যবহার করে পরিমাপগুলো সংগ্রহ করা সম্ভবপর।

বায়ুমণ্ডলে সব সময়েই কিছু বৈদ্যুতিক ফিল্ডের অস্তিত্ব থাকে। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব অঞ্চলের তুলনায় ভূসন্নিবিষ্ট স্থানগুলো সব সময়েই ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পরিষ্কার আকাশের সময় এ ধরনের বৈদ্যুতিক ফিল্ড প্রতি ফুটে ৩০ ভোল্ট হয়। এই বিশেষ শক্তিটি ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর অর্থ হল এই যে, আপনার কাছে যদি একটা সুযোগ্য ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র থাকে এবং তা দিয়ে আপনি ভূ-পৃষ্ঠের স্তরে ও তা থেকে ৩ ফুট উঁচু স্তরের ভোল্টেজ মাপেন তা হলে দেখতে পাবেন যে ভূ-পৃষ্ঠের বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় উচ্চমণ্ডলের বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ ৯০ ভোল্ট বেশী।

মাথার উপর কোন কিউমুলাস মেঘ গঠিত হবার সময় তার নিকটবর্তী স্থানের বৈদ্যুতিক শক্তিরও পরিবর্তন শুরু হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির চিহ্ন পরিবর্তিত হলে মেঘের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক শক্তি প্রধানভাবে ধনাত্মক হতে থাকে। এইভাবে মেঘের চারদিকের বৈদ্যুতিক মেপে প্রতি ফুটে ১৫০ ভোল্ট পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

পরিচলন মেঘ গঠিত হবার সময় চার্জের বিভিন্ন গঠন-প্রণালী একের পর এক কাজ করে যায়। এর ফলে একটি মেঘে দুটো বিভিন্ন ধরনের চার্জের কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। গলনাঙ্কের একটু উপরের স্তরে যেখানে তাপমাত্রা ৩২° ফাঃ একটা বড় আকারের ধনাত্বক চার্জের স্তরের সৃষ্টি হয়। মেঘের উপরের স্তরও সম্ভবতঃ মেঘের ধারগুলো ধনাত্বক চার্জ দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি যে বজ্রঝড়ে (Dipole) দুই মেরু বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে। অর্থাৎ এর মাঝে দুটো বৈদ্যুতিক মেরু থাকে একটি ধনাত্মক ও আর একটি ঋণাত্বক।

বজ্রঝড় থেকে যখন বৃষ্টি শুরু হয় তখন কখনও বা মেঘের নীচের দিকে আর একটি দ্বিতীয় ধরনের ক্ষুদ্র ধনাত্বক চার্জের স্তর গঠিত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় মেঘের মধ্যে কিভাবে চার্জের কাজ সম্পন্ন হয় তা ১৪নং চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এ উদাহরণটি থেকে মনে রাখতে হবে যে মেঘের বৈদ্যুতিক গঠনাবলী এখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক অতটা সহজ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে ঋণাত্বক চার্জের অঞ্চলেও বহু সংখ্যক ঋণাত্বক চার্জবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন মেঘ ও বৃষ্টিবাহী অণু বিদ্যমান থাকতে পারে। এ অঞ্চলকে তবুও ঋণাত্বক বলা হয় কারণ এখানে ঋণাত্বক বৈদ্যুতিক গুণাবলীর সংখ্যার চেয়ে দেড় গুণ বেশী। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে মেঘের মাঝে চার্জগুলো সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত থাকে না। প্রতিটি বড় বড় চার্জবিশিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে পকেটের মতো কতগুলো ছোট ছোট চার্জের এলাকা বিরাজ করে।

বিজলী দেখে সহজেই বোঝা যায় যে বিজলীপাতের আগে বজ্রমেঘের মাঝে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকে সত্যি খুব বেশী। প্রতিটি প্রধান চার্জবিশিষ্ট এলাকার শক্তি ২০ কলম্ব বা কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে একটু কম হতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এ শক্তিটি তা আর একটু বেশীও হতে পারে। কলম্ব কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষেত্রে চার্জের একটা খুব বড় রকমের পরিমাপক নয়। দুটো সমান্তরাল ধাতব পদার্থকে ২০ কলম্ব বৈদ্যুতিক চার্জ দ্বারা পরিপূর্ণ করে এদের মধ্যেকার ভোল্টেজের তারতম্য যদি বেশ কম পরিমাণে রক্ষা করা হয় তা হলে আস্তে আস্তে বৈদ্যুতিক চার্জ ক্ষরণের ফলে এখানেও খুব অল্প পরিমাণ বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হবে। অন্যদিকে বজ্রবাহী মেঘের চার্জের প্রচ্ছন্ন শক্তি খুবই বড় রকমের হয়। কতক ক্ষেত্রে এ শক্তির পরিমাণ ১০০,০০০,০০০ ভোল্টেরও বেশী হয়ে থাকে। বিজলী স্ফুলিঙ্গের সময় মাত্র ৫ সেকেণ্ডের কয়েক হাজার ভাগ সময়ের মধ্যে এ ধরনের কেন্দ্র থেকে বৈদ্যুতিক ক্ষরণের ফলে অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের অস্বাভাবিক বড় আয়তনের বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে খুব বড় রকমের তাপমাত্রার সূচনা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হবে।

গঠনশীল পরিচলন মেঘের মধ্যে সংরক্ষিত বৈদ্যুতিক চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মেঘের মধ্যে ও তার নীচের স্তরে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আমরা জানি যে ভাল আবহাওয়ায় ভূমিতে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি ফুটে ৩০ ভোল্ট। কিউমুলাস মেঘের চারদিকে এ শক্তির পরিমাণ হল প্রতিফুটে ৫৫০ ভোল্ট। বজ্র মেঘের মধ্যে ঠিক একটা বিজলী চমকানোর পূর্বমুহূর্তে এ শক্তিটি দাঁড়াবে প্রায় প্রতি ফুটে ৫০,০০০ ভোল্ট। কোন পর্যবেক্ষণ দ্বারা সোজাসুজিভাবে এ ধরনের বিরাট শক্তি মাপা আজও সম্ভবপর হয়নি। তবে আমরা জানি যে এ ধরনের বৈদ্যুতিক ক্ষরণের জন্য এ আয়তনের শক্তি থাকার প্রয়োজনীয়তা একটা বেশ যুক্তিসম্পন্ন ব্যাপার। পরীক্ষণাগারের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে বৃষ্টিবাহী বাতাসের মাধ্যমে এরূপ বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য খুব বড় ধরনের বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়।

বিজলী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে বজ্রমেঘের মধ্যে চার্জ গঠিত হওয়ার পদ্ধতি ও ঐ সব চার্জ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

বজ্রমেঘ চার্জ করার পদ্ধতি

গত ৪০ বছর ধরে বজ্রমেঘের মাঝে চার্জ সৃষ্টি করার পদ্ধতি সম্পর্কে বহু প্রকল্প প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্প বেশ কতকগুলো জানা তথ্যের সঙ্গে মোটেই মিলে না বলে এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। বর্তমান অবস্থায় এ পর্যন্ত চার থেকে পাঁচটি প্রকল্প প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর যুক্তি বেশ জোড়ালো বলে মনে হয়ে থাকে। এগুলো দিয়ে অন্ততঃ কতকগুলো জানা তথ্যের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বছর বছর ধরে সংরক্ষিত পর্যবেক্ষণগুলো দিয়ে মাত্র একটা দুটো প্রকল্প ছাড়া অন্য সবগুলো সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

বজ্রঝড়ের মধ্যেকার বিদ্যুৎ সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ প্রকল্প তৈরী করে তা দিয়ে এখন পর্যন্ত পাওয়া সমস্ত গ্রহণযোগ্য পর্যবেক্ষণগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা করা আজও সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। একটি আদর্শ প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ববর্ণিত অধ্যায়ে বৈদ্যুতিক চার্জ বণ্টনপ্রণালী থেকে শুরু করে চার্জ সৃষ্টি করার নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে। মেঘের মধ্যে প্রথম বৃষ্টি বিন্দু গঠিত হবার ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় পর প্রথম বিজলী স্ফুলিঙ্গের জন্য এ ধরনের চার্জের আয়তন আবার বেশ বেশী হওয়া প্রয়োজন।

যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক এসব বিষয় নিয়ে সাধনা করেছেন তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে মেঘের মধ্যে তুষার বিন্দু গঠিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বজ্রঝড়ের মাঝে কোন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয় না। উষ্ণ অঞ্চলের বাইরের দিকের দেশগুলোতে শুধুমাত্র জলবিন্দু দ্বারা গঠিত মেঘের মাঝে কোন প্রকার বিজলীপাত হতে দেখা যায় না। বিজলীর প্রথম ঝিলিক চোখে দেখার সময় মেঘের মধ্যে বরফের টুকরো থাকে। এ কথাটি আজকাল প্রায় নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া হয়ে থাকে। যা হোক শুধুমাত্র একথাটি দিয়েই বিজলীপাতের জন্য বরফের প্রয়োজন অনিবার্য কি-না এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রকৃত সমাধান পাওয়া সম্ভবপর নয়। খুব দ্রুত গঠনশীল পরিচলন মেঘের বেলায় বৃষ্টিবিন্দু সৃষ্টির সময় বৈদ্যুতিক চার্জের প্রক্রিয়া হয়তো বা কাজ করতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ উচ্চতায় উপনীত হলে মেঘের মাঝে বরফের বিন্দু গঠিত হতে শুরু করে। এ সময়ে হয়তো বা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াও একইভাবে কাজ করে

যেতে থাকে। এর ফলে মেঘের মধ্যে আরও চার্জের সৃষ্টি হয়ে বিজলীপাত সংঘটিত হতে পারে।

বৈদ্যুতিক চার্জ গঠিত হওয়ার জন্য বরফের টুকরার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে মেঘ বিদ্যুৎ গঠন-প্রণালী বর্ণনা করার জন্য আজ পর্যন্ত নানারূপ প্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এ সব প্রকল্পকে দুভাগে বিভক্ত করতে পারি। যেমন (১) যে-সব প্রকল্পে বরফের টুকরোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। (২) যে-সব প্রকল্পে বরফের টুকরোর প্রয়োজনীয়তা নেই। আমরা বহু যুগ ধরে জানি যে বায়ুমণ্ডলে এক প্রকার ছোট ছোট চার্জ বিশিষ্ট অণু থাকে এবং তার নাম ‘‘আয়ন’’। এগুলো বাষ্পের অণু বা ধূলাকণা আকারে বায়ুমণ্ডলে বিরাজ করে। যে-সমস্ত প্রকল্পে বরফের অণুর প্রয়োজন নেই সেখানেও বৃষ্টি মেঘ ও বৃষ্টিবিন্দুর মাঝে এ ধরনের আয়নের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে সি. টি আর. উইলসন নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সর্ব প্রথম এ ধারণাটি প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন যে মেঘের প্রথম অবস্থায় বৈদ্যুতিক ফিল্ডে বড় ধরনের বারি বিন্দুগুলো ধনাত্মক আয়নের সঙ্গে মিশ্রিত হতে শুরু করে। ঋণাত্মক আয়ন মেঘের ঊর্ধ্ব-প্রবাহের ফলে উপরের দিকে ধাবিত হয়। লণ্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের বি. জে. ম্যাসন যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে এ ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে দু'রকমের চার্জগুলো দ্রুত গতিতে পৃথক করা সম্ভবপর নয়। তাঁর এই বিশেষ যুক্তিটি অনেক বৈজ্ঞানিকই মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে এ. ডি. লিটল ইনকোরপোরেটেডের বার্নাড ভনগাট ও চার্লস বি. মুর জানিয়েছেন যে উইলসনের এ প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণের ফল থেকে পাওয়া চার্জের হারের সঙ্গে খুব ভালভাবে মিলে যায়। এঁরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া শুধুমাত্র বারিবিন্দু গঠনের পূর্বেই শুরু হয় না এর মাধ্যমে মেঘের মধ্যে বারিবিন্দু সৃষ্টির হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পঞ্চাশ সালের মধ্য ভাগে যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থার রসগান নামক একজন আবহাওয়াবিদ মেঘ বিন্দুর আয়ন সংগ্রহের উপর বেশ কিছু সংখ্যক গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি মেঘের নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়নিক চার্জের সঙ্গে বৃষ্টি বিন্দুর চার্জ সম্পর্কীয় কতকগুলো সূত্র দ্বারা বজ্রঝড়ের চার্জ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে বেশ কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক বরফের অণু থেকে সৃষ্ট চার্জের তুলনায় আয়নিক চার্জের ব্যাপারটিকে একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প বলে মনে করে থাকেন। ৫০ সালের শেষ দিকে ইংল্যাণ্ডের জী. সি. সিমসন প্রস্তাব করেন যে বরফের স্ফটিকের মাঝে সংঘাতের ফলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জগুলো পৃথক হয়ে পড়ে। এই বিশেষ ব্যাপারটি মেঘের বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রক্রিয়ার জন্যই চার্জগুলো পৃথক হয়ে পড়ে—কিন্তু এসব চার্জের আয়তন খুব কম হয় বলে এ প্রকল্পটি দিয়ে বজ্রঝড়ের চার্জের পরিমাণ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়।

নিউমেক্সিকোর খনিজ ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ই. জে. ওয়ার্কসম্যান তাঁর সহকর্মী স্টিফেন ই. রেনল্ডস এবং মার্কস ব্রুক বরফের অণুর সঙ্গে চার্জ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিশেষ যুক্তিসম্পন্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেন। পরীক্ষাগারে বহু সংখ্যক পরীক্ষার মাধ্যমে এঁরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পান যে মেঘের ভিতরে বরফের অণুর বহু পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর। এঁদের প্রারম্ভিক কাজগুলো থেকে দেখা যায় যে পানি জমাট হলে বরফ সাধারণতঃ ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে পড়ে এবং পানির চার্জ ধনাত্মক হয়। এ পরীক্ষণের ফলাফল দিয়ে এঁরা বজ্রঝড়ের চার্জ গঠনের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব করেন। অতি শীতল জলবিন্দু জমাট জলবিন্দুকে আঘাত করলে সে-সব জলবিন্দুও বরফে জমাট হতে শুরু করে। এ সমস্ত পানি জমাট হওয়ার পূর্বে এদের চারদিকের প্রবাহমান বাতাস যদি কিছু পানি টেনে নিয়ে যায় তা হলে সেই সব বরফের অণুতে শুধুমাত্র ঋণাত্মক চার্জ বিরাজ করবে। ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট ছোট ছোট পানির টুকরো তখন বায়ুর ঊর্ধ্বপ্রবাহের মাধ্যমে মেঘের উপরের দিকে প্রবাহিত হবে। ব্যবস্থাটির একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হোল এই যে এ ধরনের বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া পানির মালিন্যের উপর নির্ভরশীল। গবেষণা করে দেখা গেছে যে নিউমেক্সিকোর বজ্রঝড়ের পানি জমাট হওয়ার পদ্ধতিটি ঐ ধরনের প্রকল্পের সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ব্যাখ্যা করতে পারে না। এর ফলে পঞ্চাশ সালের মধ্যভাগে আরও কতগুলো নতুন ধরনের পরীক্ষার

কাজ শুরু হয়। নিউমেক্সিকোর বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষণাগারে বরফের স্ফটিকের সঙ্গে ছোট নরম ধরনের শিলার সংঘর্ষের ফলে কি হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করেন। এঁদের পরীক্ষণের ফল থেকে দেখা যায় যে দু টুকরো বরফ ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ করে একত্রে নিয়ে আসলে তাদের মধ্যকার বৈদ্যুতিক চার্জগুলো সঙ্গে সঙ্গে পৃথক হয়ে যেতে থাকে। তার ফলে বরফের টুকরো দুটোর মাঝে তাপের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উষ্ণ টুকরোটি ঋণাত্মক ও ঠাণ্ডা টুকরোটি ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট হয়ে থাকে। বজ্রঝড়ের মধ্যকার ছোট ছোট শিলার টুকরো বরফের স্ফটিকের চেয়ে সম্ভবতঃ উষ্ণ হতে পারে। এর ফলে শিলার টুকরোতে ঋণাত্মক চার্জ এবং ঠিকরে পড়া বরফের স্ফটিকে ধনাত্মক চার্জ পরিলক্ষিত হয়। শিলাখণ্ডগুলো মেঘের মধ্যে ও নিম্নভাগে পতিত হলে বরফের স্ফটিকগুলো মেঘের চূড়া বা তারচেয়েও উপরের স্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। নিউমেক্সিকোর বৈজ্ঞানিকরা এ থেকে প্রমাণ করেন যে এ প্রক্রিয়ার ফলে যথেষ্ট পরিমাণ চার্জ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এঁরা এই প্রকল্পটির সাহায্যে বজ্রঝড়ের মধ্যেকার বিরাট আয়তনের বৈদ্যুতিক চার্জের ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন। ১৯৬১ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জে. লাথাম ও বি. জে. ম্যাসন আর একটি পরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করেন। এ ফলাফলটি একটু আগে বর্ণিত পরীক্ষণটির ফলের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। যা হোক, এঁরা প্রস্তাব করেন যে অতি শীতল বারিবিন্দুর সঙ্গে ছোট নরম শিলার সংঘর্ষের সময় একটি বেশ ফলপ্রদ চার্জ গঠনের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এঁরা লক্ষ্য করেন যে বারিবিন্দু জমাট হবার সময় ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট এক প্রকার ছোট ছোট বরফের ফালি বাইরে নির্গত হতে থাকে। যুক্তিটি সত্য হলে মেঘের মাঝে আরও অনেক পরিমাণ বরফের স্ফটিক দেখা যাওয়া উচিত ছিল। যুক্তি দেখিয়ে অনেকেই এ প্রকল্পটি পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে পারেন নি।

সার কথায় বলতে গেলে পরীক্ষণাগারের পরীক্ষা ও মুক্ত বায়ুমণ্ডলের পর্যবেক্ষণের দ্বারা এ-কথা প্রমাণিত হয় যে বরফের অণু মেঘ বিদ্যুতের চার্জ গঠনের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে আবার এমন কতগুলো মেঘের মধ্যে বিজলীপাত হতে দেখা যায় যেগুলোর মধ্যে বরফের স্ফটিকের উপস্থিতি মোটেই আশা করা যায় না। এ ধরনের

মেঘ সাধারণতঃ উষ্ণমণ্ডলীয় সাগর অঞ্চলে দেখা গিয়ে থাকে। এবং এর ফলে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন রকমের স্ফটিকের অস্তিত্ব থাকে না। এ ধরনের কতগুলো বিক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে নানা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে বটে, তবুও এসব পর্যবেক্ষণগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার কোন রকম যুক্তি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিকের মতে বড় ধরনের পরিচলন মেঘ বিদ্যুৎকরণের জন্য একাধিক প্রক্রিয়া একই সঙ্গে কাজ করে যেতে পারে। আমরা জানি যে বৃষ্টি গঠনের জন্য দুটো প্রধান প্রক্রিয়া কাজ করে। একটি প্রক্রিয়ার জন্য বরফের স্ফটিকের প্রয়োজন হয়। আর একটির জন্য এর প্রয়োজন হয় না। আরও বেশী গবেষণা না করলে বড় চার্জের অঞ্চল গঠনের জন্যও এসব প্রক্রিয়া কাজ করে কিনা সে কথা সঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

বিজলীপাত পর্যবেক্ষণ

উজ্জ্বল আলোর বিজলীছটাকে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বজ্রঝড়ের স্বাক্ষর হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠে আঘাত করলে বিজলীর ছটা ঝলমল করে উঠে। বিজলীর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭,৫০০ বার বনে আগুন লাগে বলে হিসেব পাওয়া যায়। আমেরিকায় এ ধরনের আগুনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ২৫,০০০,০০০ ডলার এর মতো অনুমান করা হয়। খুব মূল্যবান কাঠ প্রস্তুত হতে যুগের পর যুগ সময় লাগে অথচ এ ধরনের আগুনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এসব কাঠ ছাই-এ পরিণত হয়। এ ছাড়াও এর প্রকোপে অসংখ্য বন্য জন্তুর প্রাণহানি হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ স্থানগুলো পর্যন্ত এসব বিজলীপাতের ফলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। (৯ নং চিত্রে দেখুন)

আমরা সবাই জানি যে বিজলীপাত শুধুমাত্র বনের মধ্যেই সীমিত থাকে না। ঘর-বাড়ি ও মানুষের উপরও এর প্রকোপ বেশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ১৯৫৮ সাল থেকে দশ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছরই গড়ে ১৮০ জন লোক শুধুমাত্র বিজলীপাতের ফলেই মৃত্যুবরণ করেছে। ক্যানসার রোগ

বা গাড়ী দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হারের তুলনায় এ সংখ্যাটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় বটে,— (শুধুমাত্র গাড়ী দুর্ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ১০০ জন লোকের প্রাণহানি হয়ে থাকে।) কিন্তু তাই বলে বিজলীপাত থেকে বেঁচে আসা মানুষের জন্য এ ধরনের সংখ্যাতত্ত্ব খুব একটা সান্ত্বনার ব্যাপার বলে মনে হবে না। বিজলীপাতের জন্য মৃত্যুবরণ বেশ দুঃখজনক হতে দেখা যায়। সৌভাগ্যবশতঃ বিজলীপাত থেকে বাঁচার জন্য আজকাল ঘরে বা গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় নিলেই বিপদের সম্ভাবনা বেশ কমে যায়। ঝড়ের সময় গাছের নীচে আশ্রয় নেওয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক। বহুকাল থেকে আবহাওয়াবিদরা জনসাধারণের কাছে এ কথা তুলে ধরা সত্ত্বেও বহু মানুষ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজও গাছের নীচেই আশ্রয় নিয়ে বিজলীর প্রকোপে প্রাণ হারিয়ে থাকে। লম্বা বিচ্ছিন্ন গাছগুলো বিজলীপাতের সবচেয়ে উপযোগী স্থান।

বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিজলীপাত সম্পর্কে খুব কম তথ্যই মানুষের জানা ছিল। মানুষ শুধু জানতো যে বিজলী দেখতে উজ্জ্বল, গরম, সামান্য সময়ের জন্য এ থেকে কিছুটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যায় এবং এগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য বিরাজ করে থাকে। দ্রুত কার্যকরী ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাদির উন্নতির সঙ্গে বিজলী সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

১৯০২ সালে ইংল্যাণ্ডের চার্লস বয়েজ সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্যামেরার মাধ্যমে তিনি প্রতিটি বিজলীপাতের সময় ছবি নিতে শুরু করেন। বয়েজ যদিও তাঁর পরিকল্পনা দিয়ে খুব স্বার্থক কোন ছবি গ্রহণ করতে সক্ষম হননি তবে তাঁর এই বিশেষ চিন্তাধারাটি পরবর্তীকালে খুবই কার্যকরী হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বি. এফ. জে. স্কনল্যাণ্ড বয়েজের যন্ত্রপাতির নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করে আর একটি ক্যামেরা তৈরি করেন। এ ক্যামেরাটি খুবই ভাল কাজ করে এবং এ দিয়ে তিনি মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিজলীপাতের বিভিন্ন মূল্যবান ছবি তুলতে সক্ষম হন।

এর পর আরও বহু বড় ধরনের দামী ক্যামেরাও এ পরিকল্পনার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। বিজলীপাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হলে অনুভূমিক-

ভাবে তাড়াতাড়ি ঘুরে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থাসম্পন্ন দুটো লেন্সের প্রয়োজন হয়। ছবি নেবার সময় লেন্স দুটোর অবস্থান পরিবর্তন করে ফিল্মটি ঘুরিয়ে দিতে পারলেই এ ধরনের ছবি তোলা বেশ সোজা হয়ে যায়। এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জোড়া জোড়া ছবি নেওয়া সম্ভবপর। এ ধরনের ছবি তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে আপনি বহু কিছু জান্‌তে পারবেন। আজকাল প্রতি সেকেণ্ডে ২৫,০০০ ফ্রেমেরও বেশী ছবি নেবার মতো ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে। মাত্র কিছুদিন হলো বায়ুমণ্ডল বিষয়ক পদার্থবিদেরা এ ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে বিজলীপাত সম্পর্কে গবেষণার কাজ শুরু করেছেন। চোখে দেখা বিজলীপাত সম্পর্কে আমরা যা জানি তার সবই প্রায় বয়েজের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি থেকে পাওয়া তথ্য মাত্র। এ বিষয়ে আজকালকার নতুন ক্যামেরাগুলোর লেন্স আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলে হয়তোবা আরও নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গত বিশ বছর ধরে বিজলীবাহী মেঘের সমস্ত তথ্যই ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের কয়েক ভাগ সময়কে ছবির মাধ্যমে পৃথক করা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। ইলেকট্রনিক পদ্ধতির বেলায় এ কথাটি মোটেই প্রযোজ্য নয়। বিজলীর সঙ্গে বায়ু প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সম্পর্ক আছে, ফলে বিজলীপাতের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চার্জের অস্তিত্ব ও গতির পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বৈদ্যুতিক ফিল্ড ও তার পরিবর্তনের পরিমাণ অনুমান করতে পারলে তার একটু অন্যভাবে বিজলীপাত সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের কাজ পরিচালনা করা যায়।

বিজলীপাতের সময় এক প্রকার বেতারের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণ বেতার যন্ত্রে যে-সব স্থির বিদ্যুতের শব্দ হয় সেগুলোকে এ ধরনের ঢেউয়ের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বায়ুমণ্ডলের নাম থেকে এগুলোকে "sferies" নামে অভিহিত করা হয়। "sferies"-এর ঢেউ যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করে বিশ্লেষণ করতে পারলে আমরা বিজলীপাতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

আজকাল জানা গেছে যে বিজলীপাতের সঙ্গে কতকগুলো বিজলী ঢেউ বয়ে গিয়ে থাকে। এধরনের ঢেউয়ের আলোর প্রগাঢ়তা কোন সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে দেখার মতো উজ্জ্বল নয়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এগুলো সহজেই

দেখা যেতে পারে। এছাড়াও মেঘের মধ্যে চার্জের গতি চোখ দিয়ে বা ফটো তুলে দেখা মোটেই সম্ভবপর নয়। এর জন্যও ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ পদ্ধতিটির মাধ্যমে এসব প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে কাজ করে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

বিজলীপাত

তারতম্য অনুসারে বিজলীপাতকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন (১) মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিজলীপাত (২) মেঘে মেঘে বিজলীপাত।

মেঘ থেকে মেঘের বিজলীপাতগুলো সাধারণতঃ ভূমি স্পর্শ করে না। বজ্রঝড় সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা গ্রহণ করতে হলে এগুলো পুরোপুরিভাবে বুঝতে হবে। এ বিষয়টির কতগুলো ব্যবহারিক তাৎপর্যও রয়েছে। বিমানে চলার সময় প্রায়ই এ ধরনের বিজলীপাত হতে দেখা গিয়ে থাকে। এখানে আমাদের জেনে রাখতে হবে যে এ অবস্থাটি বিমানের জন্য খুব বিপজ্জনক না হলেও বেশ একটা ভীতিপ্রদ ব্যাপার। আধুনিককালের বাণিজ্যিক ও যুদ্ধ বিমানগুলো মেঘ থেকে উদ্ভূত সোজাসুজি বিজলীপাতের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তৈরী করা হয়। এধরনের বিজলীপাতের মধ্যে বিমান পড়লে হঠাৎ করে খুব উজ্জ্বল আলো ও বজ্রের শব্দ শোনা যায়। এ অবস্থায় বেশ ঝাঁকুনিও অনুভূত হতে পারে। কিন্তু তার জন্য বিমানের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় বিমানের পাখায় ১″ ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ স্থান পুরে গিয়ে হয়তোবা একটু গর্তের মতো সৃষ্টি হতে পারে। কখনও বা বিমানের বেতার যন্ত্রের এরিয়াল পুড়ে যায়। খুব হলে হয়তোবা বিমানের একটা "পিটট" টিউব ফিউজ হয়ে যেতে পারে। যাই হোক না কেন বিমান চালনার জন্য এ ধরনের ছোট ছোট ক্ষতি খুব একটা বড় ব্যাপার বলে পরিগণিত হয় না। বিমান উড্ডয়নের ব্যাপারে এ ধরনের ক্ষতি বিমান চালনার নিরাপত্তার উপর কোন বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অভিজ্ঞ বৈমানিকরা এগুলোকে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গ্রহণ করে থাকেন। এখন মেঘ থেকে ভূমিতে বিজলীপাত সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এগুলো কিভাবে

গঠিত সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার। কেন এ ধরনের বিজলীপাত সংঘটিত হয় এ তথ্যটি আমাদের জানা আছে। বিজলীপাতকে মেঘের মধ্যে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক সংঘাত নির্গমনের একটা পন্থা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া চলার সময় মেঘের মধ্যে চার্জের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মেঘ ও ভূমির মধ্যে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক পরিবেশ আরও বেশী শক্তিশালী হয়। জলবিন্দুর উপস্থিতির ফলে এই বৈদ্যুতিক পরিবেশের পরিমাণ প্রতি ফুটে ৩০০,০০০ ভোল্টস এ পৌঁছে গেলে বায়ুর স্তরের মাঝে ভাঙন ধরে। এ অবস্থায় মেঘের মধ্যে বড় আয়তনের বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করার শক্তি কমে যায়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে বৈদ্যুতিক চার্জের কোন রূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বা প্রচণ্ড ব্যবধানের জন্য বিজলীপাত সংঘটিত হয় না। কতগুলো অণুক্রমিক অবস্থার মাধ্যমে বিজলীপাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। বজ্রঝড়ের মাঝে সর্বপ্রথম 'stepped leader'' অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ক্রমশঃ ভূমির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। স্কনল্যাণ্ড সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে এক প্রকার "বাতাসে ভেসে যাওয়া পথ প্রদর্শক পতাকার" পিছনের দিকে এসব "stepped leader"-গুলো বিরাজ করে থাকে। তিনি অনুমান করেন যে বৈদ্যুতিক পরিবেশ বৃদ্ধি পেলে বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রোনের ত্বরন বৃদ্ধি পায় এবং যদি এই ত্বরনের গতি প্রতি মিনিটে ৯০ মাইলের উপরে উঠে তখনই এ অবস্থার সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ উপরে বর্ণিত বাতাসে ভেসে যাওয়া পথ প্রদর্শক পতাকা তৈরী হয়।) মেঘের নিম্নভাগ খুব বেশী পরিমাণ ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট হয় বলে এর মধ্যে ঋণাত্মক ইলেকট্রন সরিয়ে দেওয়ার এক প্রকার শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শক্তি বাতাসের অণুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলে আয়নের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ইলেকট্রন নির্গমনের ফলে ৪'' ব্যাসবিশিষ্ট প্রায় ৫০ গজ লম্বা আয়নের সারিও সৃষ্টি হতে দেখা গিয়ে থাকে। আয়নের উপস্থিতির ফলে বায়ুর বৈদ্যুতিক পরিবহণ শক্তি বেড়ে যায় এবং তার ফলে বৈদ্যুতিক চার্জগুলো প্রথমবস্থায় খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে। পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গেছে যে বিজলীপাতের ক্ষেত্রে তথা কথিত "stepped leader অবস্থাটি সত্যি বিরাজ করে থাকে। 'বাতাসে

ভেসে ধাওয়া পথ প্রদর্শক পতাকার" আলোর উজ্জ্বলতা খুব কম বলে এগুলোর ছবি নেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে "stepped leader"-গুলো খুব সহজেই অনুসন্ধান করা সম্ভবপর। প্রতি মাইক্রো সেকেণ্ডে এগুলো গড়ে প্রায় ৫০ গজ পর্যন্ত নীচে নামতে পারে। এক মাইক্রো সেকেণ্ড=(প্রতি সেকেণ্ডের ১০০০০০০ ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র। এরপর ৫০ থেকে ১০০ মাইক্রো সেকেণ্ড বিরতির পর আবার ৫০ গজের আর একটি নিম্নমুখি গতির সূচনা হয়। এই বিশেষ "leader"-টি ভূমির নিকটবর্তী স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত এ অবস্থা ক্রমাগতভাবে চলতে থাকে। এক সেকেণ্ডের ১০০ ভাগের ১ ভাগ সময়ের মধ্যে এ "leader"-টি মেঘ থেকে ভূমিতে পৌঁছতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ বা ৫০ গজ দূরত্বে উপনীত হলে চার্জবিশিষ্ট আয়নগুলো উপরের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে। উর্ধ্ব ও নিম্নমুখি বৈদ্যুতিক চার্জের সংযোগ স্থলে বিদ্যুতের "প্রত্যাপর্ণ অবস্থা" সংঘটিত হয়।

বিজলীপাতের স্থানগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন স্থান। একটি বিরাট আয়তন বিশিষ্ট চার্জ এই স্থান নিয়ে প্রবাহিত হবার সময় হঠাৎ করে খুব উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে থাকে। এ আলোটির বিশেষত্ব আমরা সবাই বেশ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে।

বিচ্ছিন্নভাবে কোন লম্বা গাছ বা দালানের সম্মুখে পরলে "নিম্নগামী নিশানটি" (streamer)-কে উর্ধ্বগামী চার্জের সঙ্গে মিশ্রিত হতে খুব অল্প দূরত্ব পেরিয়ে আসতে হয়। তার ফলে এসব ক্ষেত্রে ছোট ছোট গাছ বা দালান-কোঠার তুলনায় বিজলীপাত সংঘটিত হয়ে থাকে।

প্রতিহত বিজলীর নামটি খুব প্রচলিত শব্দ হিসেবে ব্যবহার হলেও শব্দটির বিশেষ অর্থ সত্যি খুব বিভ্রান্তকারী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ছবি থেকে দেখা যায় যে বিজলীপাতের আলোকময় অগ্রভাগটি এই পথের উপরের দিকে প্রসারিত হয়, কিন্তু বৈদ্যুতিক চার্জগুলো প্রকৃতপক্ষে নীচের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। "shepped leader" ঠিক ভূ-পৃষ্ঠের নীচে স্পর্শ করার পূর্বে বিদ্যুৎপূর্ণ পথটি (etectrified channel) আয়ন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। প্রতি ঘন সেন্টিমিটার বায়ুতে তখন $১০^{৪}$টি আয়ন থাকে। "stepped leader"-এর পথে তখন প্রতি ইঞ্চিতে আয়নের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায়

$১০^{১৬}$টি আয়নের মতো। এই বিশেষ স্তরটি যখন ভূমির সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংস্পর্শে উপনীত হয় তখন আয়নগুলো খুব তাড়াতাড়ি সেই পথ দিয়েই নির্গত হতে শুরু করে। সবচেয়ে নীচের স্তরটি সর্বপ্রথম নীচে আসে এবং তারপর একের পর এক করে সিঁড়ির মতো উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তর নীচের দিকে ধাবিত হতে থাকে। প্রতিহত শক্তির উজ্জ্বল মাথাটি একইভাবে উঁচু থেকে উচ্চতর স্তরে এগিয়ে গিয়ে ক্রমে আবার মেঘ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। প্রতিহত শক্তিটি আলোর শক্তির ১০ ভাগের ১ ভাগ গতিতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। মেপে দেখা গেছে এ ধরনের উজ্জ্বল পথটি কয়েক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ৪০ থেকে ৫০ মাইক্রো সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে এভাবে খুব বড় আকারের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। মেঘের সঙ্গে ভূমির বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সংঘটিত হলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ৩০,০০০০ এম্প্যায়ার থেকে ২০০,০০০ এম্প্যায়ারেরও বেশী হতে পারে। বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাত্রা বৈদ্যুতিক শক্তি গঠনের হারের তুলনায় খুবই মন্থর গতিতে কমতে থাকে। প্রায় ২৫ মাইক্রো সেকেণ্ড পরে এ ধরনের বৈদ্যুতিক প্রবাহের আয়তন পরিপূর্ণ অবস্থার তুলনায় অর্ধেকও হতে পারে।

গত কয়েক বছর ধরে বিজলীপাতের পথে তাপমাত্রা অনুমান করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। বিজলীপাতের আলোকরশ্মির বর্ণালীর সাহায্যে এ ধরনের পরিমাপকার্য পরিচালিত করা হয়। সজ্ঞবদ্ধ বিজলীপাতের সারি বা কোন বিচ্ছিন্ন বিজলীপাতের আলোকচিত্র সংগ্রহ করে এগুলোর লাল থেকে অতি বেগুনি অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে এক প্রকার বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় ছবি নেওয়া হয়ে থাকে। এ সমস্ত বিজলীপাত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিশদভাবে পরীক্ষা করে এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়ন. ই. সেলানিভ বিজলীপাতের গড় তাপমাত্রা ৪৫,০০০ ফা: হয় বলে অনুমান করতে সক্ষম হন। তাপমাত্রার এই বিশেষ অঙ্কটি ১৯৬০ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. ওয়ালেসের হিসাব ও ১৯৬১ সালের তৈরি দুজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকের হিসেবের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। এ ধরনের বিরাট তাপ সৃষ্টি হয় বলে বিজলীপাতের ফলে গাছ ও ঘরবাড়ি পুড়ে যাওয়ার কারণটি এখন অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

প্রতিহত বিজলী শক্তি শেষ হয়ে যাবার পূর্বে বিজলীয় পথ থেকে বহু সংখ্যক চার্জ বেরিয়ে যায়। তাই বলে সে অবস্থায় সমস্ত চার্জই মেঘ থেকে বেরিয়ে যায় না। বহু চার্জএর পরেও বিজলীর মধ্যেই থেকে যেতে পারে। এগুলো তখন ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন ও ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট অক্সিজেন ও নাইট্রজেনের অনুরূপে বিরাজ করে। বিজলীপাতের বৈদ্যুতিক প্রবাহ যখন কমে যায় তখন তার মধ্যেকার ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট অণুর সঙ্গে পুনরায় মিশ্রিত হতে থাকে। এ প্রক্রিয়াটি চলার সময় বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একটা বেশ ভাল রকমের পরিবাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। আয়নগুলো পরস্পরের সঙ্গে ভাল করে মিশ্রিত হওয়ার আগেই একই স্থান থেকে আবার একটি দ্বিতীয় বিজলীর সূচনা হয়।

একটি বৈদ্যুতিক পরিবাহকের পথ বিরাজ করার জন্য এ ক্ষেত্রে "stepped leader" প্রক্রিয়া পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা মোটেই থাকে না। এর পরিবর্তে "Dort leader" নামে আর একটি প্রক্রিয়া আলোর শক্তির শতকরা ১০০ ভাগের ১ ভাগ গতিতে মেঘ থেকে ভূমিতে বিজলীপাত সৃষ্টি করে। এগুলো ভূমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শক্তিশালী প্রতিহত শক্তির সূচনা হয়। কখনও কখনও বেশ সময় পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহ একের পর এক করে চলতেই থাকে। প্রতি সেকেণ্ডের একশ ভাগের মাত্র কয়েকভাগ সময়ের মধ্যে ৪০ বা তার চেয়েও বেশী সংখ্যক প্রতিহত বিজলীপাত সংঘটিত হতে পারে। অবশ্য খুব মারাত্মক অবস্থাতেই এ ধরনের বিজলীপাত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এ সময়ের মধ্যে ৫ টা থেকে ১০ টা বিজলীপাত মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এগুলো সব একই পথ ধরে অগ্রসর হয়ে থাকে। খালি চোখে প্রতিহত বিজলী থেকে অন্য কোন বিজলীর পার্থক্য বোঝা মোটেই সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে যে-সব বিজলীপাত ১ সেকেণ্ড সময় পর্যন্ত দেখা যায় সেগুলো সত্যি অস্বাভাবিক ধরনের শক্তিশালী কোন কোন পর্যবেক্ষক এ ধরনের বিজলীপাতগুলোকে চঞ্চল আলোক ছটার মতো দেখতে পেয়েছেন। সম্ভবতঃ বিচ্ছুরিত আলোর উজ্জ্বল ও কম উজ্জ্বল বিকিরণের ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিহত বিজলীগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে একই পথ অনুসরণ না করার জন্যও এরূপ দেখা যেতে পারে। একটি বিজলীপাত থেকে আর একটি বিজলীপাতের অবস্থানের সামান্য পরিবর্তন মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই অসংখ্য বিজলীপাত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে স্কনল্যাণ্ড এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেন। আজকাল এ বিষয়ে আরও বিশদ রকমের গবেষণা চলে আসছে। নিউমেক্সিকোর খনিজ ও কারিগরি বিদ্যালয়ের মার্ক ক্রক আধুনিক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিবিশিষ্ট ক্যামেরা দিয়ে মেঘ থেকে ভূ-স্পর্শকারী বিজলীপাতের বহু ছবি নিয়েছেন। এঁরা এসব ছবির সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন যে নিউমেক্সিকোর শতকরা ৯০ ভাগ বিজলীপাতগুলো সবই বহু প্রজ্জলন সৃষ্টিকারী বিজলী বিশেষ। ১৯৪২ সালে ইংল্যাণ্ডের সি. ই. আর. ক্রস এবং আর. এইচ. গোল্ডের হিসেবের তুলনায় এ সংখ্যাটি শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। নিউমেক্সিকো ও ইংল্যাণ্ডের বিরাট ভৌগোলিক দূরত্বের এ ধরনের পার্থক্যের কারণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ জায়গা দুটো শুধুমাত্র ভৌগোলিকভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়—জলবায়ুর দিক দিয়েও এ স্থান দুটির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

নিউমেক্সিকোর বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে বহু বিজলী সৃষ্টিকারী বিজলীপাতের বেলায় প্রতি সেকেণ্ডের ১০০ ভাগের কয়েকভাগ সময় বিরতির পর বিজলীপাত হয়ে থাকে। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একই বজ্রঝড় থেকে পরবর্তী প্রতিহত বিজলীটি সাধারণতঃ অন্য আর একটি পথ অনুসরণ করে থাকে। এ ফল থেকে বোঝা যায় যে এক সেকেণ্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ সময়ের মধ্যে আয়নগুলোর মধ্যেকার পরবর্তী মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয়। এটা এত তাড়াতাড়ি হয় যে এর পর বৈদ্যুতিক স্তরের অস্তিত্ব আর মোটেই দেখা যায় না।

ক্রক ও তাঁর সঙ্গীরা বিজলী চমকানোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করেন। প্রতিহত বিজলীপাতগুলোকে কোন কোন সময় অধিক শক্তিসম্পন্ন ছোট ধরনের এক প্রকার ঢেউয়ের মতো দেখা গিয়ে থাকে। এগুলো খুব তাড়াতাড়ি গঠিত হয় আবার বেশ তাড়াতাড়িই বিনষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজলীপাত খুব আস্তে আস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ শক্তি খুব তাড়াতাড়ি একটা চরম পর্যায়ে উপনীত হয় বলে পরে এই শক্তিটি খুব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এ ধরনের বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডের দশ ভাগের

কয়েক ভাগ সময় পর্যন্ত চলতে পারে। কোন কোন সময় এ প্রবাহ প্রায় অর্ধ সেকেণ্ড সময়কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ক্রমশঃ ধ্বংসশীল বৈদ্যুতিক প্রবাহটি এরপর কতগুলো দুর্বল শক্তিসম্পন্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী বিজলীপাতের ধরন ঘটিয়ে থাকে।

বজ্রঝড় থেকে যখন শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিহিত বিজলীর সৃষ্টি হয় তখন তা বেশীর ভাগ সময়েই খুব স্বল্প মেয়াদি হয়ে থাকে। কিন্তু এরপর অর্থাৎ বিশেষ করে বহু বিজলীপাতের মধ্যে শেষ বিজলীপাতটি তুলনামূলকভাবে খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ থেকে মনে হয় যে শেষ বিজলীপাতের মাধ্যমে মেঘের সমস্ত চার্জগুলো ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

কোন কোন বিজলীপাতের সময় শুধুমাত্র একটা চুমকি দেখা যায়। এবং কতক ক্ষেত্রে ২ থেকে ৪০টি চুমকিরও সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ব্যবধানের সঠিক উত্তর আজও জানা যায়নি। অনেকেই প্রস্তাব করেছেন যে বজ্রঝড় থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই অসংখ্য বিজলীপাত সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এ ধরনের প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক। প্রতি মিনিটে বৈদ্যুতিক চার্জ গঠনের হিসেব করাই খুব কঠিন ব্যাপার। সেকেণ্ডের বেশ কিছু ভাগ সময়ের বেলায় এটা আরও দুষ্কর হবে সন্দেহ নেই। বহু চুমকির সবচেয়ে জোড়ালো যুক্তি হয়তো বা এই যে বেশীর ভাগ বজ্রঝড়ের মধ্যেই বেশ বিচ্ছিন্ন ধরনের কতগুলো ঘণীভূত বৈদ্যুতিক চার্জের স্তর থাকে। ভূ-পার্শ্বস্থ খুব শক্তিশালী চার্জের অঞ্চলটি "stepped leader"-এর মাধ্যমে ভূমির সংস্পর্শে এসে প্রথম বিজলীপাতের কারণ ঘটায়। এর পর অন্যান্য চার্জবিশিষ্ট স্তরগুলো এরূপ চার্জের কেন্দ্র থেকে বা আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত স্তরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিকে ভূমিতে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়। স্কনল্যাণ্ড প্রস্তাব করেছেন যে অনুক্রমিক ভাবে একের পর একটি করে ধাপের মাধ্যমে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত চার্জের কেন্দ্রগুলো নতুন "dart leader" ও প্রধান বিজলীপাতের মাধ্যমে ভূমিতে নির্গত করা সম্ভবপর। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বহু চুমকির কারণটি ভবিষ্যতে আরও অনেক গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে।

বিজলীপাতের তারতম্য অনুসারে এগুলোর কতগুলো বিশেষ নাম দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকদের মতামতের উপর নির্ভর না করে সাধারণ পর্যবেক্ষকেরা বিজলীপাতের এসব নামকরণ করে না। প্রায় বেশীর ভাগ অবস্থাতেই এসব নাম থেকে বিজলীপাতের আকৃতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়—কিন্তু এর দ্বারা বিজলীপাত সংঘটিত হবার কারণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসেবে বাতাস খুব শক্তিশালী হলে আয়ন পরিবেষ্টিত মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত পথটি অনুভূমিকভাবে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে থাকে। এ অবস্থায় যদি বহু চমকিবিশিষ্ট বিজলীপাত ঘটে তাহলে মেঘের ধার দিয়ে বিচ্ছিন্ন চমকিগুলো পৃথকভাবে দেখা যাবে। এধরনের বিজলীপাতের নাম দেওয়া হয়েছে "ribon" বিজলীপাত। (ফিতার মতো দেখা বিজলীপাত)। কোন কোন সময় "stepped leader" ভূমি স্পর্শ করার পূর্বে কতগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে থাকে। এর ফলে প্রতিহত বিজলী দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পথ দিয়ে মূল পথটির সঙ্গে সংযোজিত থাকে। এ ধরনের অবস্থায় বিজলীপাতকে 'কাটা চামচের মতো' বিজলীপাত বলে অভিহিত করা হয়।

কতক ক্ষেত্রে মেঘ থেকে মেঘের মধ্যকার বিজলীপাতেরও নামকরণ করতে দেখা গেছে। উদাহরণ হিসেবে কখনও বা বহুদূরে বিজলীর আলো দেখা যায় অথচ মেঘকেন্দ্র দূরে অবস্থিত বলে বজ্রের শব্দ মোটেই শোনা যায় না। এ অবস্থায় মেঘবিন্দুর দ্বারা আলোর বিচ্ছুরণ ও প্রতিফলনের মাধ্যমে আকাশের বেশ কিছুটা অংশ বিজলীপাতের জন্য প্রজ্জ্বলিত হতে দেখা যায়। এধরনের বিজলীপাতকে "তাপের বিজলীপাত" বলে অভিহিত করা হয়।

সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিবেলা মেঘের মধ্যে বিজলীপাত হতে দেখা যায়। এ ধরনের বিজলী বেশ কয়েক মাইল স্থান জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। মেঘবিন্দু ও বরফের স্ফটিকের জন্য এই উজ্জ্বল আলোক রশ্মি হয়তো বা সোজাসুজিভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। মেঘবিন্দু ও বরফের দ্বারা এসব আলোর বিচ্ছুরণের ফলে মেঘের একটা মস্তবড় অংশ আলোকিত হয়। এ ধরনের বিজলীপাতকে "sheet বিজলীপাত" বলা হয়। এ ধরনের বিজলীর

ফলে কোন কোন সময় বজ্রের শব্দ শোনা যেতে পারে। বেশীর ভাগ সময়েই এ ধরনের চার্জ ই নির্গমনের স্থান খুব দূরে থাকে বলে এভাবে উৎপন্ন শব্দ মোটেই শোনা যায় না। নীল আকাশ দ্বারা বিচ্ছিন্ন বিজলীপাতের মধ্যে "sheet বিজলীপাতের" পার্থক্য খালি চোখেই বোঝা যায়। এ আলোচনার সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে প্রাথমিক চার্জ ই পদ্ধতির সঙ্গে বিজলীপাতের তারতম্যের কোন সম্পর্ক নেই। কোন কোন অবস্থায় আমরা সোজাসুজিভাবে বিজলীর আলো চোখে দেখতে পাই। এবং কখনও বা সে আলোটি মেঘ ও বরফের মাঝে দিয়ে আসে বলে বিজলীপাতগুলো দেখতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অথচ অস্বাভাবিক বিজলীপাতের নাম হোল "bead বিজলীপাত" এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি সাধারণ বিজলীপাতের চেয়ে অন্য ধরনের কিনা এ ব্যাপারটি আজও ভাল করে জানা যায় নি। সাধারণতঃ খুব কম ক্ষেত্রেই বিজলীপাতের উজ্জ্বল আলোর ছটা হঠাৎ করে একই সঙ্গে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে দেখা যায়না। বিজলী থেকে সাধারণতঃ কতগুলো বিচ্ছিন্ন আলো ও অন্ধকারের স্তরের সৃষ্টি হয়ে থাকে। উজ্জ্বল অংশটি সাধাণতঃ দশ বা ততোধিক গজ পর্যন্ত লম্বা হয় এবং কতকটা "bead"-এর দড়ির মতো দেখতে দেখা যায়। অবশ্য বিজলীপাত থেকে এ ধরনের "bead" গঠন বা তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সময়ের কাল এক সেকেণ্ডের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।

অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে "bead"-এর আকৃতি হয় বলেই এসব বিজলীপাতের মধ্যকার আলোর ছটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানের তুলনায় বেশী নাও বা হতে পারে। বক্রাকার বা দোমড়ানো অবস্থায় খুব দূরে থেকে দেখা বিজলীপাতের নীচের দিকে তাকালেও এরূপ দেখা যায়। খালি চোখে বিজলীর সামান্য একটু অংশ দেখা যেতে পারে। ধার থেকে বিজলীপাত সংঘটিত হবার সময় যেরূপ আলোর উজ্জ্বলতা দেখা যায় সে তুলনায় সোজাসুজিভাবে দেখা বিজলীপাতের আলোর পরিমাণ অনেক বেশী মনে হবে। উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলো কোনক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না সত্য তবে আজকাল এ বিষয় সম্পর্কে আরও নতুন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

নতুন যুক্তিতে বলা হয় যে উজ্জ্বল "beads"-গুলো মেঘের মধ্যেকার অধিক উজ্জ্বল আলো বিস্ফুরণের স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টিন এ. ওমান ও ওয়ালটার এইচ. ইভান্স প্রস্তাব করেছেন যে এগুলো "pinch effect" নামক এক প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়।

গবেষণাগারের পরীক্ষা ও পুথিগত হিসেব থেকে দেখা গেছে যে একটা স্বল্পবিস্তৃত পথ দিয়ে যখন খুব বেশী শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ঢেউ প্রতিবাহিত হয় তখন তার মধ্যে এক প্রকার চুম্বকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই চুম্বকের পরিবেশ থেকেই এই বিশেষ পথটির "pinching" সংঘটিত হয়। এ ধরনের স্বল্পবিস্তৃত পথে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ পর পর "pinching" দেখা গিয়ে থাকে। এ পথগুলো যেখানে খুব সরু হয় সেখানে আলোর উজ্জ্বলতাও বেড়ে যায়। এ ধরনের যুক্তি খুব আশাপ্রদ হলেও এখনও এটা একটা অপরীক্ষিত প্রকল্প মাত্র।

বজ্রঝড়ের আশেপাশে যে-সব বিজলীপাত হতে দেখা যায় তার মধ্যে "বলের মতো বিজলীপাত" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। মাত্র দশ বছর পূর্বে এ ধরনের বিজলীপাতের মোটেই কোন অস্তিত্ব আছে কি-না সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করা হোত। যা হোক বেশ কিছু সংখ্যক সুযোগ্য পর্যবেক্ষকদের বিবরণ থেকে এটা মোটামুটিভাবে একটা গ্রহণযোগ্য উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। বলের মতো বিজলীপাতকে এক প্রকার উজ্জ্বল বায়ু বলয়ের মতো দেখা যায়। এ ধরনের বলয়ের ব্যাস কয়েক ইঞ্চি থেকে শুরু করে কয়েক গজ পর্যন্ত লম্বা হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর গড় ব্যাস ১০´´ ইঞ্চি পর্যন্ত হয় বলে ধরে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আলোর বলয় কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিট সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এগুলো নীরবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কখনও বা এগুলো বিরাট রকমের শব্দ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে খুব কম সময়েই কোন ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হতে দেখা গিয়েছে। প্রায় সময়ই এসব বলয় থেকে ওজন গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়।

অনেকেই স্বচক্ষে দেখেই এ সমস্ত অগ্নি বলয়ের নানারূপ ভৌতিক বিবরণী প্রকাশ করে গেছেন। (এগুলোকে অনেক সময় অগ্নি বলয় বলা হয়ে থাকে)।

কোন কোন সময় পর্দাবিশিষ্ট ঘরের দরজা বা জানালার উপর এগুলো খুব মৃদুভাবে ভাসমান থাকতে দেখা যায়। ঘরের মধ্যে চুলোর চিমনির নীচে বা দরজার ক্ষুদ্র ভাঙা অংশের মধ্যেও এ ধরনের বলয় দেখতে পাওয়া গেছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের বলয়াকার অগ্নিপিণ্ড বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পরে আবার বাইরে বেরিয়ে যেতেও দেখতে পাওয়া গেছে বলেও অনেকে উল্লেখ করেছেন। বিজলীপাত সৃষ্টিকারী ঝড়ের সময় বলের মতো বিজলী সংঘটিত হয়। এজন্য বজ্রঝড়ের বৈদ্যুতিক চার্জ ও বিজলীপাত থেকে এর প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার জন্য বহু প্রকল্পের অবতারণা করা হয়। কতকগুলো বিশেষভাবে জ্ঞাত গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে ১৯৫৫ সালে জি. এল. ক্যাপিটজা নামক একজন বিশিষ্ট রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এ সম্পর্কে একটি প্রকল্প প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে বিজলীপাতের ফলে যে বেতারের ঢেউ সৃষ্টি হয় তার দ্বারাই এ ধরনের প্রজ্জ্বলিত আলোর শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি বলেন যে এগুলো নিয়নের বাতির মতো বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়।

মিনি ও সোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ই. এল. হিল এরপর এ সম্পর্কে আরও একটি প্রকল্পের অবতারণা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে মেঘ থেকে ভূমির মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জ নির্গমনের সময় ভূ-পার্শ্বস্থ কতগুলো স্থানে এক প্রকার অস্বাভাবিক ধরনের ঘনীভূত চার্জের স্তরের সৃষ্টি হতে পারে। এসব স্থানের আয়নগুলো সংমিশ্রিত হবার সময় অধিক চার্জবিশিষ্ট অণু থেকে চার্জ নির্গমনের ফলে এক প্রকার আলোর বিচ্ছুরণ সংঘটিত হতে পারে। এরূপ আয়তনবিশিষ্ট আয়ন ঘণীভূত হবার সময় প্রকৃতপক্ষে এ প্রক্রিয়া চলে কিনা সে বিষয়ে আজও কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হিল যুক্তি দেখিয়েছেন যে তার প্রকল্পটি দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড সময় পর্যন্ত বিরাজমান অগ্নিবলয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, কিন্তু ক্যাপিটজার প্রকল্প দিয়ে স্থায়িত্বের সময়ের ব্যাখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

একথা সত্য যে বলের মতো বিজলীপাত সংঘটিত হওয়ার কারণগুলো থেকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাথমিক জিজ্ঞাসার উত্তর আজও সঠিকভাবে খুঁজে

পাওয়া যায় নি। ক্যাপিটজা, হিল ও আরও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের প্রকল্পের সাহায্যে অগ্নি বলয়ের সমস্ত জানা তথ্য বা কতগুলো সম্ভাব্য ধারণার উত্তর সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়। আমরা এখানে সম্ভাব্য কথাটির উল্লেখ করলাম কারণ এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক পরিমাপক পাওয়া গেছে। এ বিষয়ের বেশীর ভাগ তথ্যই অগ্নিবলয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে থেকেই পাওয়া গিয়ে থাকে। আমরা যদি এ সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম তাহলে কোথায় এবং কেন এ ধরনের বলের মতো বিজলীপাত হয় তার সঠিক কারণও হয়তো বা এতদিনে নির্ণয় করে ফেলতে সক্ষম হতাম। সঠিক যন্ত্র দ্বারা এসব পরিমাপক মাপা খুবই সহজসাধ্য হোত সন্দেহ নেই।

এ সম্পর্কে যে-সব আধুনিক গবেষণা চলছে তার বেশীর ভাগ তথ্য স্কনল্যাণ্ডের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে। পুথিগত প্রকল্প ছাড়াও আজকাল পরীক্ষণাগারেও বলের মতো বিজলীপাত সৃষ্টি করার নানারূপ পরীক্ষার কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব পরীক্ষণ স্বার্থক হলে কুয়াশাচ্ছন্ন অগ্নিবলয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের আর একটি নতুন ধারণার সূচনা হতে পারে।

বজ্র

সাধারণতঃ বিজলীপাত বলতে এক প্রকার বড় রকমের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বুঝিয়ে থাকে। বজ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক লেখকই বিস্ফোরণের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের বড় রকমের উত্থানের ফলে মাত্র ১ সেকেণ্ডের কয়েক ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে বিজলীপাতের স্থানের তাপমাত্রা ৪০,০০০° থেকে ৫০,০০০° ফাঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এর জন্য হঠাৎ করে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে এক প্রকার শব্দের ঢেউয়ের সৃষ্টি হতে পারে। এগুলো বাইরের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ১,১০০ ফুট গতিতে অগ্রসর হয়। শব্দের উৎস থেকে খুব দূরে চলে গেলে এসব ঢেউ খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে।

আরও আলোচনা শুরু করার পূর্বে একথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে বজ্র গঠনের প্রথম অবস্থাতে সাধারণতঃ বায়ুর আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়ে বরঞ্চ হ্রাস পেয়ে থাকে। বিজলীপাতের ফলে সৃষ্ট খুব উচ্চ তাপ মাত্রার কথা ভাবতে গেলে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হবে। কিভাবে এরূপ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সেকথা এখন একটু আলোচনা করে দেখা যাক। অনেকেই প্রস্তাব করেছেন যে বিজলীর সময় সবচেয়ে বেশী বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংঘটিত হলে এক প্রকার চুম্বকের পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই চুম্বকের পরিবেশের প্রভাবে বিজলীপাতের সঙ্কীর্ণ স্থানটির মাঝে "pinching" শুরু হয়। "bead" সম্পর্কে আমরা এধরনের একই প্রক্রিয়ার কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এ ধরনের "pinching"-এর ফলে হঠাৎ করে ক্ষণিকের জন্য বায়ুমণ্ডলের আয়তন হ্রাস পায় এবং তার পর সেই আয়তন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এর ফলেই শব্দের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বজ্রের বিভিন্ন অবস্থা সংক্রান্ত পরিমাপকের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত খুবই কম পরিমাণে পাওয়া গেছে। ১৯১৩ সালে উইলহেম স্কিমিড নামে একজন বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করেন। সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার আর একজন বৈজ্ঞানিক ভি. আই. আরঘাদজীও এরূপ একটি কাজ শুরু করেন। এঁরা দুজনেই শব্দের "frequency" মেপে চাপের তারতম্যের সঙ্গে শব্দের ঢেউয়ের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

নানা কারণের জন্য এখনকার পাওয়া পরিমাপকগুলো ব্যাখ্যা করা একটা বেশ দুষ্কর ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বজ্রঝড় সম্পর্কে পূর্বে যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হোত আজকাল তার কোন সঠিক তথ্যাদি পাওয়া যায় না বলে ঐ ধরনের যন্ত্র দিয়ে নেওয়া পর্যবেক্ষণের মাপ কিরূপ হবে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করাও সম্ভবপর নয়। শব্দের "frequency" ও পরিমাণ সঠিকভাবে মাপার জন্য খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং উচ্চমানের যন্ত্রপাতি ও রেকর্ডার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এগুলো ঠিক মতো ব্যবহার না করলে এসব যন্ত্র দ্বারা নানারূপ ভুল তথ্যসংগ্রহের সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রের "frequency" মাপার জন্য আর একটা বড় অসুবিধা হোল এই যে স্থানের উপর নির্ভর করে শব্দের ঢেউ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে।

নিকটবর্তী কোন স্থানে বিজলীপাত হবার পূর্বে আপনি সাধারণতঃ একটি ক্লিক শব্দ শুনতে পাবেন। "stepped leader" ঠিক ভূমির সংস্পর্শে আসলে এ শব্দটি শোনা যায়। বজ্রের প্রকৃত শব্দটি ঊর্ধ্বগামী চার্জের সঙ্গে নিম্ন স্তরের "stepped leader"-এর দ্রুততর গতিতে মিলিত হবার সময় উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রতিহত বিজলীপাত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ঢেউ কোন শ্রোতার কানে পৌঁছার বিশেষত্বটি শুধুমাত্র বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এই বিশেষ ব্যাপারটির সঙ্গে বিজলীপাতের (১) স্থানের দূরত্ব (২) মহাশূন্যে এসব স্থানের পরিবর্তন এবং (৩) তার গঠন প্রণালীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বায়ুর গতি, বায়ুমণ্ডলের তাপের তারতম্য এবং হ্রদ বা পরিখার প্রভাবের জন্য শব্দের যথেষ্ট তারতম্য হয়ে থাকে।

কতকগুলো অসুবিধা দূর করার ব্যাপারে নানা ধরনের পর্যবেক্ষণমূলক কাজ চালিয়ে যেতে হয়। সুবিধা মতো ছবি থেকে বিজলীর অবস্থান, গঠন ও স্থান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে। বজ্র রেকর্ড করার উপযোগী সমস্ত যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও এগুলোর রেকর্ড করতে গিয়ে আপনাকে যথেষ্ট ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সমস্ত যন্ত্র বসানোর পর এগুলোর মাঝে কখন বিলীপাত হবে তার জন্য অপেক্ষা করা দরকার।

বজ্র সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য আজকাল বেশী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না। বায়ুমণ্ডলীয় পদার্থবিদরা নানা ধরনের চমকপ্রদ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছেন বলেই হয়তোবা এ বিষয়ের গবেষণার সংখ্যা খুব কমই দেখা যায়। যাই হোক বায়ুমণ্ডলের এই উপেক্ষিত গবেষণার কাজটি হয়তোবা খুব শীঘ্রই বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বজ্র সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় আমরা নিজেরাই জানি। বিজলীপাতের স্থান যদি দশ মাইলের চেয়েও কম দূরে অবস্থিত হয় তাহলে আমরা বজ্রের শব্দ শুনতে পাই। বায়ুর গতি যদি স্থির হয় অথবা বায়ুপ্রবাহ যদি ঝড় থেকে আপনার দিকে আসে তাহলে সম্ভবতঃ ২০ মাইল দূরে থেকেও বজ্রের শব্দ শুনতে পাওয়া যেতে পারে। বিজলীপাতের স্থান থেকে উদ্ভূত আলো আরও অনেক দূর থেকে দেখা সম্ভবপর। শুষ্ক অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০ মাইলের বেশী দূর থেকে বিজলীর আলো দেখা গিয়ে থাকে।

বিজলীর আলো ও বজ্রের শব্দ শুনে ঝড়ের দূরত্বটি খুব সহজেই অনুমান করা যায়। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। প্রতি সেকেণ্ডের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ সময়ের মধ্যে আলো ১৮৬ মাইল পথ অতিক্রম করে। অনুমানের সুবিধার জন্য বিজলীর আলো ও বিজলীপাত একই সঙ্গে সংঘটিত হয় বলে ধরে নেওয়া যাক। শব্দ মাত্র প্রতি ৫ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে ১ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। এর ফলে বিজলীপাত দেখার পর তা থেকে উৎপন্ন শব্দ শোনা পর্যন্ত সময়টুকু মাপতে পারলে বিজলীপাতের উৎসের দূরত্ব সহজেই অনুমান করা যাবে। বিজলীর আলো থেকে শব্দ শোনার সময়ের পার্থক্য থেকে প্রতি ৫ সেকেণ্ডের জন্য ১ মাইল করে দূরত্ব হিসেব করে নিলেই বিজলী উৎসের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে বিজলীপাতের সময় বিজলীর উৎস বেশ দূরে থাকলে এধরনের হিসেব কাজ করবে। মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত উল্লম্ব বিজলীপাত ২ থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে বেশ সঠিকভাবে মেঘের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

বিজলী নির্গমনে পথটি দুমড়ানো বা বাঁকা হয়ে ভূ-স্পর্শ করলে তখন বিজলীর উৎস থেকে দূরত্ব বলতে গেলে ঐ পথের কোন বিশেষ অংশের দূরত্ব বুঝাতে হবে। যে-কোন বিজলীপাতের পথ ঠিক মাথার উপরের দিকে হয়তোবা এক মাইল দূরে অবস্থিত থাকে অথচ এটা প্রায় দুই মাইল দূরে গিয়েও ভূমি স্পর্শ করতে পারে। শব্দ কিন্তু সমস্ত স্থান জুড়ে প্রায়ই একই সময়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সর্ব প্রথম ঠিক মাথার উপর কিছুটা গোলযোগ শুনতে পাওয়া যায়। প্রায় দুমাইল বিস্তৃত স্থান থেকে একের পর এক করে শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। এর ফলে বজ্র থেকে সর্ব প্রথম খুব বেশী শব্দ এবং পরে ক্রমশঃ ভাঙা ভাঙা শব্দ শোনা যায়। এ ধরনের ভাঙা ভাঙা শব্দ প্রায় ৫ সেকেণ্ড সময় পর্যন্ত শোনা গেছে বলে জানা গেছে।

অন্যভাবেও বজ্রের শব্দ শোনা যেতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে শব্দের ঢেউ উঁচু জায়গা থেকে প্রতিহত হয়ে এক প্রকার প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে থাকে।

কোন কোন সময় বজ্রঝড়ের সংখ্যা এত বেশী হয় যে অনেকগুলো বিজলী একের পর এক করে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে থাকে। এ ধরনের শব্দের ঢেউ পরস্পর মিশ্রিত হয়ে এক প্রকার ভাঙা ভাঙা শব্দের সৃষ্টি করতে পারে।

১৯৬০ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলফ্রেড জে. বেয়িলার্ড দেখিয়েছেন যে মেঘের মধ্যে শব্দের ঢেউয়ের প্রতিফলনের ফলে বজ্রঝড়ের ভিতরে এক প্রকার বড় রকমের শব্দের আলোড়নের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি তাঁর গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিজলীপাতের স্থানগুলো খুব সক্রীয়ভাবে শব্দের ঢেউ প্রতিফলিত করতে পারে। এর জন্য বিজলীপাত হওয়ার সময় আমরা সর্ব প্রথম বিজলী থেকে উৎপন্ন প্রথম ঢেউয়ের শব্দ ও পরে প্রতিফলিত শব্দ শুনতে পাই। নানা স্থান থেকে বিজলীপাত সংঘটিত হয় বলে বজ্রের সঙ্গে এক প্রকার দীর্ঘস্থায়ী ভাঙা ভাঙা শব্দও শোনা গিয়ে থাকে। কখনও কখনও বিজলীপাতের ক্ষরণ খুব দূরে হয় বলে এগুলো শুধু চোখে দেখা যায়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই বিজলীপাত হবার সময় বজ্রও সৃষ্টি হয়ে থাকে। কতকক্ষেত্রে বিজলীপাতের সঙ্গে বজ্র নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্ষরণের হার কম হলে খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ হতে পারে। অসংখ্য প্রতিহত বিজলীপাত থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি দীর্ঘস্থায়ী বিজলীর মাঝে চার্জের গতি হ্রাসের জন্য খুবই অল্পমাত্রার বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় মেঘের মাঝে এক প্রকার উজ্জ্বল স্তরের সৃষ্টি হয়। এ স্তরটি খুবই ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়। এর ফলে এ ক্ষেত্রে বায়ু সম্প্রসারণের হার সাধারণতঃ স্বাভাবিক ধরনের প্রতিহত বিজলীপাতের তুলনায় বেশ কম হয়। খুব বড় দালান বা মেঘের মধ্যে চার্জ ক্ষরণের সময় এরূপ দেখা যায়।

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বজ্র সম্পর্কে আমাদেরকে এখনও আরও অনেক কিছু জানতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

ঝড় বশীভূত করার প্রচেষ্টা

এতদিন পর্যন্ত মানুষ বজ্রঝড়কে সৃষ্টিকর্তার তৈরি একটা অস্ত্র হিসেবেই মনে করে এসেছে। সবাই এসব ঝড়কে দুর্বার বলে মনে করে। বিধাতার দেওয়া শাস্তির মতো এসব ঝড় তাদের চলার পথে ধন-সম্পত্তির নানারূপ ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে। বিজলীর সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে মানুষ ও ধন সম্পত্তি একই সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে এসব ঝড়কে আজকাল এক প্রকার বিরাট ধরনের গঠন ব্যবস্থার একটা অঙ্গ বলে পরিগণিত করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণাও পরিবর্তন হতে চলেছে। যারা প্রকৃতির এসব তথ্য সম্ভার দিয়ে মানব জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করে চলেছেন তাঁদেরকেই আমরা বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করে থাকি। বৈজ্ঞানিকেরা পর্যবেক্ষণগুলো এক সঙ্গে সাঁজিয়ে ধরেছেন যেমন, কোথায় সবচেয়ে বেশী বিজলীপাত হয়? এগুলো দেখতে কেমন? কখন এসব ঝড় থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও শিলাপাত হয়? কখন বজ্রনিনাদ সংঘটিত হয়?—এ ধরনের আরও বহু প্রশ্ন। সমস্ত যুক্তিতর্ক বেশ সোজা করে তুলে ধরে বজ্রঝড় সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সর্ব প্রথম জেনে নিতে হবে। তারপর হয়তোবা ঝড় থেকে রক্ষা পাবার পন্থাগুলো জানার জন্য আর বেশী বেগ পেতে হবে না।

বজ্রঝড়ের সম্ভবতঃ সবচেয়ে ভীতিপ্রদ ব্যাপার হোল বিজলীপাত। এগুলো থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ হয় এবং ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। ফ্রাঙ্কলিন ও তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকেরা বিজলীপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানারূপ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এ বিষয়ে ফ্রাঙ্কলিনের সাফল্য সর্বজনবিদিত। বিজলী প্রতিরোধকারী লৌহ খণ্ডের আবিষ্কার করে তদানীন্তন-কালের বৈজ্ঞানিকদের মাঝে তিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মানুষ হিসেবে পরিচিত হন। তিনি পরীক্ষা করে সর্বপ্রথম দেখতে পান যে বিজলী, বিজলীপাত

এক প্রকার বৈদ্যুতিক চার্জের ক্ষরণশক্তি মাত্র। এরপর ফ্রাঙ্কলিন যুক্তি দেখালেন যে বড় বড় বাড়ি ও গীর্জার চূড়াগুলো বিজলীপাতের জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্থান। বিজলীর ফলে এসব স্থান দিয়ে বড় রকমের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংঘটিত হয় বলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা খুব বেড়ে যায়। এ অবস্থায় কাঠের বাড়িতে আগুন লাগে। পাথরের তৈরি দালানে এত বেশী তাপ বৃদ্ধির ফলে পাথর খুলে পড়ে যায়। ইটের দেওয়ালের মধ্যেকার জলীয় বাষ্প ও বায়ু অধিক তাপের জন্য আয়তনে বেড়ে যায় বলে তা থেকে সৃষ্ট বিরাট অকারের চাপ দালান ভেঙে ফেলে।

ফ্রাঙ্কলিন সিদ্ধান্ত করেন যে এ ধরনের বিরাটাকার বৈদ্যুতিক প্রবাহগুলো ঘর বাড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে না দিলে দালান কোঠার কোন ক্ষতি হতে পারে না। তাঁর তৈরি এই বিশেষ প্রকল্পটি খুবই সোজা ব্যাপার। চোখা এক প্রকার ধাতব পদার্থের কাঠি দেওয়ালের সবচেয়ে উঁচুস্থানে উপরের দিকে মুখ করে রেখে দিতে হবে। ধাতব পরিবাহক বা ভারি ধরনের বৈদ্যুতিক পরিবাহক তার দিয়ে এই বিশেষ ধাতব কাঠিটি সংযোজিত করে আর একটি ধাতব কাঠি মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। মাথার উপর দিয়ে কোন বজ্রঝড় প্রবাহিত হওয়ার সময় তা থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহ গ্রহণ করার জন্য এসব কাঠি সব সময় তৈরি হয়ে থাকবে। এ কাঠিগুলো দালানের সবচেয়ে উঁচু স্থানে থাকলে বিজলী সর্বপ্রথম এ কাঠির সংস্পর্শে আসবে।

এ ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যুৎপ্রবাহ আর দালান দিয়ে বয়ে যেতে পারবে না। বিজলী প্রতিরোধক কাঠি খুবই উত্তপ্ত হয় থাকে। খুব বড় আয়তনের বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রবাহিত হলে কখনও কখনও এসব কাঠির কিছু অংশ গলেও যেতে পারে। কাঠি গলে গেলেও বাড়িটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাপদই থাকবে।

ফ্রাঙ্কলিনের সময় থেকেই বিজলী প্রতিরোধকারী কাঠির ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। এখন যে-সব বিজলী প্রতিরোধক কাঠি ব্যবহৃত হয় সেগুলো সবই ফ্রাঙ্কলিনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অনুরূপ। এই ক্ষুদ্র কাঠিগুলো সত্যি খুব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এ ব্যবস্থাটি দিয়েই বিজলীপাতের সমস্ত ধ্বংসলীলা প্রতিহত হয়নি। এখনও বিজলীপাতের

ফলে কোটি কোটি ডলারের সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষ করে বিজলী-পাতের ফলে শুধুমাত্র বনে আগুন লাগার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে লক্ষ্য করেছি যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যতীত বজ্রঝড়ের আরও কতগুলো শক্তি প্রতি বছর আমাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে থাকে। শিলার ফলে প্রতি বছর বিরাট এলাকা জুড়ে ফসলের ভীষণ ক্ষতি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ সমতলভূমি অঞ্চল বিশেষ করে নেবরাস্কা, ক্যানসাস ও কলরেডো প্রদেশগুলো শিলা বৃষ্টি গঠিত হবার জন্য খুবই অনুকূল স্থান বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর বহু বড় বড় ফল চাষের স্থান-গুলোতে শিলার প্রাদুর্ভাবে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। ৪০ সালের মধ্য ভাগ থেকে শিলাপাত বন্ধ করার জন্য বহু প্রচেষ্টা চলে এসেছে। আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টাই বিশেষ ফলপ্রদ হয়নি। অনুসন্ধান চলছে এখনও পুরোদমে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এসব সমস্যা সম্পর্কে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করব।

বজ্রঝড়ের আর একটি বড় অস্ত্রের নাম হোল "তড়িৎ বন্যা"। প্রচণ্ড বৃষ্টি-পাতের ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ছোট ছোট নদী ভরে গিয়ে তীর অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের আকস্মিক বন্যা পৃথিবীর যে-কোন স্থানে সংঘটিত হতে পারে। এ ধরনের সবচেয়ে মারাত্মক অধিকতর শুষ্ক অঞ্চলে সংঘটিত হতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে নিউ মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চল ও এরিজোনা প্রদেশে এরূপ বন্যা প্রায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলের বহু নদী ও খাড়িগুলো বছরের বেশীর ভাগ সময়েই সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে। এসব অঞ্চলে গাছ গাছড়ার সংখ্যা বিরল বলে এখানকার মাটি খুব বেশী পানি নীচে চুষে নিতে পারে না। এ ছাড়াও এসব স্থানে পাহাড় ও উপত্যকার সংখ্যা খুব বেশী।

মাত্র এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে আর একটু বেশী সময় বৃষ্টি হলে এসব স্থানের নদী ও খাড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যেহেতু ঝড় সাধারণতঃ উচ্চ অঞ্চলে বেশী হয়। তার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের পানি সঙ্গে সঙ্গেই নদীতে পতিত হয়। সামান্য পরিমাণ পানি মাটির নীচে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

গাছপালা না থাকার জন্য পানি নিষ্কাশনের পথ মোটেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তার ফলে দ্রুত প্রবাহমান পানি খুব শীঘ্রই নদীগুলো পরিপূর্ণ করে ফেলে।

প্রতি বছর বহু সংখ্যক ছোট ছেলেমেয়ে এবং অনেক সময় বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত এ ধরনের নদী বা পরিখা পারে মৃত্যু বরণ করে থাকে। কোন সময় রাস্তার মাঝ দিয়ে নীচু অঞ্চলের দিকে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে।

রাস্তায় চলার সময় মটর গাড়ী রাস্তার বাইরের জল প্রবাহে পতিত হয়ে নদীর মধ্যে শোলার টুকরার মতো ভাসতেও দেখা যায়। এর প্রকোপে কোন কোন ক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পর্যন্ত মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে।

এটা সত্যি দুঃখজনক যে কতকগুলো বজ্রঝড় থেকে বৃষ্টিপাতের হার খুবই বেশী পরিমাণ হয়ে থাকে। বজ্রঝড় থেকে তৈরি বৃষ্টি কখনও বা কোন কোন অঞ্চলের ফসলের সমৃদ্ধি ঘটায় আবার কোথাও বা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন স্থানে পরিচলন মেঘের বৃষ্টির মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা পায়। বিশেষ ধরনের প্রয়োজনীয়তার জন্য হাল্কা, মাঝারি এবং কখনও বা খুব বেশী শক্তিশালী বজ্রঝড়ের জন্য আমরা প্রায়ই প্রার্থনা করে থাকি। যা হোক তবুও খুব বড় রকমের বজ্রঝড় বা ধ্বংসকারী ঝড়ের জন্য কোন প্রতিকার করা যায় কি-না এটাও আমরা সব সময়েই চেষ্টা করে চলেছি। এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি অর্জন করার জন্য নানা ধরনের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে।

বজ্রঝড়ের গঠন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

ফ্রাঙ্কলিন বিজলীপাত থেকে ঘরবাড়ি রক্ষা করার জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর এই বিরাট সাফল্যজনক আবিষ্কারের পর থেকে দু'শ বছর সময় পর্যন্ত বজ্রঝড়ের গঠন-ব্যবস্থা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চলে এসেছে। মানুষ এসব ঝড়ের গঠন-ব্যবস্থা পরিবর্তন ও এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছে। আপনি যদি কোনভাবে ঝড়ের মধ্যেকার বিরাটাকার চার্জের কেন্দ্র গঠিত হবার পথ বন্ধ করে দিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য কোন বিজলী প্রতিরোধক কাঠির প্রয়োজন হবে না। কারণ তখন আর কোন

বিজলীপাতই সংঘটিত হবে না। অবশ্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই যে আপনি কিভাবে এসব ঝড় নিয়ন্ত্রণ করবেন?

ফ্রাঙ্কলিনের জন্মের পূর্বে পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা নানারূপ ধর্মীয় মতের দ্বারা বিধাতাকে এসব মারাত্মক ঝড় বন্ধ করার জন্য আবেদন জানাতেন—আধুনিক যুগে এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আরও কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের দিকে বড় বড় কামান দাগিয়ে শব্দের ঢেউ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে ঝড়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা—সে সম্পর্কে এ যুগেও নানারূপ প্রচেষ্টা পরিচালনা করা হয়। মেঘের উপরে ধূলোবালি নিক্ষেপ করার পদ্ধতি এবং কিছুদিন পূর্বেও আর একটি বিশেষ প্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হোত। পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল এই যে সে সময়ে বজ্রঝড় সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য মানুষের জ্ঞাত ছিল না। কিছু কম পরিমাণে হলেও একথা আজকের জন্য সত্য বলেই পরিগণিত হতে পারে। এ বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সবকিছু জানতে না পারা পর্যন্ত এগুলো পরিবর্তন করার কোন সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়।

১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সালে বজ্রঝড় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রচেষ্টাগুলোর প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। পরিচলন মেঘের গঠন-ব্যবস্থা ও তা থেকে সৃষ্টি বৃষ্টিপাত সম্পর্কীয় তথ্যাবলীর সংখ্যা আজকাল অনেক বেড়ে গেছে।

৩০ সালের প্রথম ভাগে টরবারগানন নামক নরওয়ের একজন আবহাওয়াবিদ বৃষ্টিপাত সম্পর্কে একটি নতুন প্রকল্পের অবতারণা করেন। তিনি তাঁর প্রকল্পে উল্লেখ করেন যে বৃষ্টি গঠিত হবার জন্য জলবিন্দু ও বরফের স্ফটিকের তাপ হিমাঙ্কের নীচে হতে হবে। ১৯৪৬ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির পরীক্ষণাগারে ইরভিং ল্যাংমুর এবং ভিনসেণ্ট জে. স্কফার এ ধারণাটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এরা পরীক্ষা করে অতি শীতল মেঘের একটি অগভীর স্তরকে এরূপভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। (৩২° ফাঃ এর নীচের তাপ মাত্রার মেঘবিন্দু।) এঁরা পরীক্ষণাগারে অতি শীতল মেঘের মাঝে শুষ্ক বরফের টুকরা (ধাতব কার্বন-ডাই-অক্সাইড) প্রবেশ করিয়ে বরফের স্ফটিক তৈরি করতে সক্ষম হন। পূর্ববর্ণিত প্রকল্পটিতে বরফের স্ফটিক গঠিত হবার পর মেঘের মধ্যে দিয়ে নীচে পড়তে শুরু করে বলে অনুমান

করা হয়েছিল। এই পরীক্ষাটি বহুবার বেশ সার্থকভাবে প্রমাণ করা সম্ভবপর হয়।

এ ধরনের পরীক্ষণের সার্থকতা ঝড়ের অবস্থা পরিবর্তন করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিজলীপাত ক্ষতিকারী শিলাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত কমানোর জন্য বৈজ্ঞানিকেরা নানা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বৈদ্যুতিক চার্জ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বজ্রঝড়ের বৈদ্যুতিক গুণাবলী পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করার আগে প্রকৃতি কিভাবে এসব প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে বেশ ভাল রকমের ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে বহু বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ছোট ছোট বরফের টুকরোর সঙ্গে অতি শীতল জলীয় বাষ্প বা বরফের স্ফটিকের সংমিশ্রণের ফলে বজ্রঝড়ের মাঝে চার্জ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কাজ করে থাকে। অনেকেই যুক্তি দেখিয়েছেন যে পরিচলন মেঘের উপরের ভাগটি যদি সম্পূর্ণ বরফের স্ফটিক দ্বারা গঠিত হোত তা হলে চার্জই সৃষ্টির কারণ অনেকগুণে কমে যেতে পারতো। এটা তৈরী করা সম্ভবপর হলে বিজলীপাত একেবারেই বন্ধ করা যায়।

অতি শীতল মেঘগুলোর মাঝে শুষ্ক বরফের টুকরা বা বিশেষ ধরনের কোন ক্ষুদ্র আয়তনের রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে বরফের স্ফটিক গঠন করা সম্ভবপর। এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে "silver iodide" সাধারণত খুব বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্ষেপণাস্ত্র, বেলুন বা বিমানের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে "silver iodide" ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থটি খুব বেশী তাপের সম্মুখীন হলে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প যখন ঠাণ্ডা হয় তখন ছোট ছোট—"silver iodide"-এর স্ফটিক গঠিত হয়। এ সমস্ত স্ফটিকের ব্যাস দাঁড়ায় ০·০১ থেকে ১·০ মাইক্রন পর্যন্ত। এ স্ফটিকগুলো ২০ ফাঃ এর নীচের তাপমাত্রায় উপনীত হলে মেঘের মধ্যে বরফের স্ফটিক গঠিত হতে শুরু করে।

মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিজলীপাত প্রতিরোধ করার জন্য এ ধরনের মেঘ গঠন প্রক্রিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক সংস্থা থেকে ব্যবহার করে দেখা হয়েছে। বজ্রঝড়ের মধ্যে বৃষ্টি তৈরী করার ফলে বিজলীপাতের সংখ্যা কমে যায় কি-না বহু পরীক্ষণের পরেও সে কথা আজ সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভবপর হয়নি।

একটি বজ্রঝড়ের অবস্থা থেকে পরবর্তী বজ্রঝড় গঠনের মাঝে খুব বড় রকমের পার্থক্য থাকে বলে এ ধরনের ছোট প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করা সত্যি খুবই দুষ্কর ব্যাপার। সম্ভবতঃ এ ধরনের বৃষ্টি তৈরী করার ফলে বিজলীপাতের সম্ভাবনা কমে যায়; কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা এগুলো নির্ণয় করা খুবই কঠিনসাধ্য ব্যাপার। অন্যদিকে এ কথাও বলা যেতে পারে যে এসব পরীক্ষণ দিয়ে হয়তোবা কোন ফলই পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বৃষ্টি তৈরী করার জন্য যে পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তার পরিমাণ এত কম হয় যে তা দিয়ে বজ্রঝড়ের মধ্যেকার সমস্ত অতি শীতল মেঘবিন্দুকে বারিবিন্দুতে পরিবর্তিত করা সম্ভবপর হয় না। বড় আকারে বৃষ্টিবিন্দু সৃষ্টি পদ্ধতি পরিচালনা করতে হলে আরও অধিক পরিমাণ শুষ্ক বরফ বা ''silver iodide'' ব্যবহার করা প্রয়োজন। বজ্রঝড়ের বরফ ও পানির এই বিশেষ প্রকল্পটি সত্য হলে মেঘের মধ্যে "বড় আকারের বারিবিন্দু'' সৃষ্টি করতে না পারলে বজ্রমেঘের বৈদ্যুতিক গুণাবলীর পরিবর্তন লক্ষ্য করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে।

যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞরা চার্জ পৃথক করার জন্য বরফের টুকরার প্রয়োজন নেই বলে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে বরফের স্ফটিক থেকে বৃষ্টি তৈরির এ পদ্ধতিটি খুব একটা আশাপ্রদ ব্যাপার নয়। এঁদের মতে, পরিচলন ও বজ্রমেঘের নীচের স্তরের আয়নের গুণাবলীর পরিবর্তন করা সম্ভবপর হলে এ সমস্ত মেঘ উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিরও পরিবর্তন করা যাবে।

এ মতবাদে বিশ্বাসী বার্নাড, ভনগার্ড ও চার্লস মুর ইতিমধ্যেই পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে ছোট ছোট পরিচলন মেঘের বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। ইলিনয়স প্রদেশের রাষ্ট্রীয় জল জরিপ বিভাগের সহায়তায় ইলিনয়সে ৩৩ ফুট উচ্চতায় ৮·৭ মাইল বিস্তৃত একটি বৈদ্যুতিক তার বিস্তার করে এরা এই পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করেন। এই তারগুলোর মাধ্যমে অতি উচ্চমাত্রায় বৈদ্যুতিক

শক্তি প্রবাহিত করে মেঘের নিম্ন অঞ্চলের তথাকথিত যথা শূন্যের চার্জের পরিবর্তন সাধন করে। এঁরা বজ্রঝড়ের বৈদ্যুতিক শক্তির রূপান্তর করতে সক্ষম হন। তার থেকে নির্গত এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি বায়ুর অণুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি করে।

এ ধরনের তারের কাছাকাছি স্থানে পরিচলন মেঘ গঠিত হলে উর্ধ্ব প্রবাহের জন্য নীচের স্তরের বায়ু মেঘের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ সমস্ত আয়নগুলো যখন মেঘ বিন্দুর সংস্পর্শে আসে তখন মেঘের মাঝে বৈদ্যুতিক চার্জের সৃষ্টি হয়। এ পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে তার থেকে যে চার্জ নির্গমন করা হয় তা দিয়ে মেঘের চার্জের চিহ্ন স্থির করা সম্ভবপর। যখন ধনাত্মক চার্জ নির্গমন করা হয় তখন মেঘ ও ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট হয়, অন্যভাবে ধনাত্মক চার্জের বেলায়ও এ নিয়ম প্রয়োজ্য হবে।

ভনগার্ড ও মুর তাঁদের এই পরীক্ষণ দিয়ে শুধুমাত্র পরিচলন মেঘের চার্জের পরিবর্তন পদ্ধতিই আবিষ্কার করেন নি; পরিচলন মেঘের মাঝে চার্জ সংগ্রহের পদ্ধতিটি আয়ন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় বলে যে প্রকল্প রয়েছে এই বিশেষ পরীক্ষণটি তাঁদের মতে তার একটি অন্যতম প্রমাণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। এ আবিষ্কারের পরে খুব অল্প সময় পরেই এঁরা আরও প্রকাশ করেন যে তাঁদের এই বিশেষ পরীক্ষণ পদ্ধতিটি বজ্রঝড়ের বেলায় সরাসরিভাবে ব্যবহার করলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। তবে তারা এখনও বিশ্বাস করেন যে এই বিশেষ তথ্যটি সম্ভবতঃ বজ্রঝড়ের বেলায়ও সত্য হতে পারে। এঁরা এ সম্পর্কে এখনও নানারূপ গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ক্ষতিকারী শিলাপাত প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টা

গত ১০ থেকে ১৫ বছর হোল ইটালী ও ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ক্ষতিকর শিলাবর্ষণের প্রতিকার করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। এ সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ৩,০০ ফুট থেকে ৫,০০০ ফুট উচ্চতায় নিক্ষেপ করে তা থেকে প্রায় ১ পাউণ্ড ওজনের বারুদ বিস্ফোরণ করা হয়। সাধারণতঃ কোন খামারের উপর দিয়ে মারাত্মক বজ্রঝড় প্রবাহিত হবার সময় এধরনের গোলাগুলী

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একবার শুরু হলে যথেষ্ট পরিমাণ বিস্ফোরক চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ইটালীতে ১৯৫৯ সালে এরূপভাবে প্রায় ১০০,০০০ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যোগসূত্রের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা হোক তবুও অনেক কৃষকই বিশ্বাস করেন যে এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলে শিলাপাতের ক্ষয়ক্ষতি কমে যায়। ইটালির বৈজ্ঞানিক অর্টাভিও ভিটরি এ ধরনের বহু সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারকারীদের অনেক কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি এঁদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পরে পরেই শিলাখণ্ডগুলো একটু নরম হয়ে যায়। এ অবস্থার শিলা বরফের টুকরার আকারে নীচে পড়তে পারে না এবং তার ফলে গাছের পাতা বা ডালপালা ভেঙে যায় না। গাছের সংস্পর্শে আসলে ছোট ছোট টুকরোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আজ পর্যন্ত কেউ এ ধরনের নরম শিলা সংগ্রহ করে রাখতে সক্ষম হয়নি, এমন কি মাটিতে পড়ার সময় এ ধরনের শিলার উপর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণও আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়নি। এর ফলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য এ ধরনের শিলা সৃষ্টি হতে পারে কি-না সে ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় নাই।

ভিটরি শিলা নরম হয়ে যাওয়ার সঙ্গে এ ধরনের বিস্ফোরণের সম্পর্ক দেখিয়ে একটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে এ ধরনের বিস্ফোরণের ফলে যে চাপের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তার জন্য শিলার মধ্যে আবদ্ধ বাতাস ও জলকণার আয়তন পরিবর্তিত হয়ে শিলার মধ্যে কিছুটা ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি কতগুলো পরীক্ষণ পরিচালনা করে দেখতে পান যে বিস্ফোরকের খুব নিকটবর্তী স্থানে এ ধরনের পরিবর্তন বেশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এরপর আরও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত পন্থা মেঘের দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। বিস্ফোরণের স্থান থেকে মেঘের দূরত্ব বেশী হলে এ পদ্ধতির দ্বারা মেঘের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবপর নয়।

পরিশেষে আমরা এই বলতে পারি যে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার পদ্ধতিটি বেশ প্রচলিত হলেও এ থেকে শিলাপাতের কোন তারতম্য হয় কি-না সে কথা

সঠিকভাবে আজও বোঝা যায়নি। যদি সত্যি এর ফলে শিলাপাতের কোন পরিবর্তন হয় তবে তা কেন হয় সে কথাও এখনও জানা যায়নি।

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে শিলাখণ্ড গঠিত হওয়ার জন্য অতি শীতল মেঘবিন্দুর প্রয়োজন হয়। বরফের "নিউক্লি" দিয়ে মেঘ গঠন করে এ ধরনের অতিশীতল পানির পরিমাণ কমানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিশেষ পন্থাটি সার্থক করতে হলে এ ধরনের মেঘকে অধিক পরিমাণে "seeding" করতে হয়। শিলাপাত সম্পর্কে আমাদের আধুনিক জ্ঞান ভাণ্ডারের তথ্যগুলো যে কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, সন্দেহ নেই।

মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করে শিলাপাতের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় একথা আজও কেউ কোন পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। এ ধরনের পরীক্ষণের বেলায় আপনি যে পরিমাণ সিলভার আইওডাইড ব্যবহার করবেন, মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করার জন্য সে পরিমাণটি সর্বদাই কম বলে মনে হবে। যে-কোন শিলা সৃষ্টিকারী বজ্রঝড় থেকে বৃষ্টিপাত তৈরী করতে হলে আমরা আজকাল যে পরিমাণ "silver iodide" ব্যবহার করে থাকি তারচেয়ে ১০ থেকে ১,০০০ গুণ বেশী ঐ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সিলভার (কণা) খুব দামী ধাতু বলে প্রতি মেঘের জন্য এরূপ "over seeding"-এর কাজ পরিচালনা করতে হাজার হাজার ডলার খরচ করতে হবে।

আজকাল "silver iodide"-এর চেয়ে কম মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে "seeding" করা যায় কি-না সে সম্পর্কে নানারূপ প্রচেষ্টার কাজ এগিয়ে চলেছে। এরূপ কোন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হলে যথেষ্ট পরিমাণ "over seeding" পরীক্ষার কাজ আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে প্রাকৃতিকভাবে কি করে এধরনের ধ্বংসাত্মক শিলার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে নানারূপ গবেষণার কাজ এখনও পুরোদমে চলে আসছে। এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত শিলাপাত সৃষ্টির প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে সঠিক না-ও বা হতে পারে। ক্রমবর্ধনশীল গবেষণার মাধ্যমে শিলাপাত গঠনের প্রকৃত কারণ ও তা পরিবর্তন করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত রোধ করার প্রচেষ্টা

ঝড়ের মধ্যে অল্প শক্তিসম্পন্ন বৃষ্টি সৃষ্টি করার সঠিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত রোধ করার প্রচেষ্টার কাজ এগিয়ে চলেছে। এজন্যও মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করার প্রকল্পটি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়।

অনেকেই যুক্তি দেখিয়েছেন যে মেঘ গঠনের প্রারম্ভিক অবস্থায় বড় আকারের লবণের টুকরা মেঘের ভূমিতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলে মেঘ গঠনের প্রাথমিক অবস্থাতেই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হতে পারে। এ ধরনের বৃষ্টি বিন্দু আয়তনে বড় হলে ঝড়ের ঊর্ধ্ব প্রবাহের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নীচে পড়তে শুরু করবে। তার ফলে এসব বারিবিন্দু মেঘের উপরের স্তরে পৌঁছতে পারবে না। ঊর্ধ্ব প্রবাহ বিরাজমান কোন উঁচু স্তরে এরূপ জলবিন্দু উপনীত হলে নিম্নপ্রবাহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এসব মেঘ ঐ স্তরের মধ্যে জমা হতে থাক্‌বে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ অবস্থার ফলে বেশ পরিমাণ বৃষ্টি বিন্দু জমা হয়ে যেতে পারে।

বড় বড় লবণের অণু দ্বারা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত রোধ করা সম্ভবপর নয়। এ তথ্যটি আজও পর্যন্ত বেশী পরিমাণ পরীক্ষণ দিয়ে প্রমাণ করা যায়নি। সত্যি বলতে কি পরীক্ষণ দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে কি-না একথাটি আজও আমরা সঠিকভাবে বলতে পারব না।

"over seeding" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত রোধ করার ব্যাপারে কতকগুলো পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। এ. পি. চুয়েভ নামে একজন রুশ বৈজ্ঞানিক শুষ্ক বরফের টুকরো ব্যবহার করে এ ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন বলে জানা গেছে। অবশ্য এ সম্পর্কীয় তথ্যাদি এখনও পুরোপুরিভাবে জানা যায়নি। প্রকল্প অনুসারে "over seeding" প্রক্রিয়া সার্থক হলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের ফলাফল যদি সত্যি সার্থক হয় তবে পরবর্তীকালে তার প্রতিক্রিয়া হয়তোবা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের তুলনায় আরও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সারমর্ম

৪০ সালের শেষের দিকে মানুষের মনে আশা ছিল যে হয়তোবা সত্বরই তারা নিজেদের ইচ্ছামতো আবহাওয়া পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের কাজ সমাপন করতে

সক্ষম হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সাফল্যের চাবিকাঠি সমস্ত সমস্যা সমাধান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। একথা সত্য যে আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে অতি শীতল মেঘের স্তরকে সহজেই অন্যরূপে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়েছে। বরফের নিউক্লিয়াসের সংযোজন দ্বারা বড় বড় বরফের স্ফটিক গঠন করে আজকাল সেগুলো মেঘের বাইরে নিয়ে আসা সম্ভবপর। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব স্ফটিক মাটিতে পড়তেও দেখা গিয়ে থাকে।

মারাত্মক বজ্রঝড়ের কোনরূপ পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এসব ঝড় পরিবর্তনের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও আজকাল আরও কতকগুলো নতুন নতুন প্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। বজ্রঝড় সম্পর্কিত সীমিত জ্ঞানই আমাদের এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বজ্রঝড়ের নিয়মাবলী এরূপ প্রচেষ্টার কোন সোজাসুজি ফল পাওয়া সম্ভবপর হবে না। এখানে একথা মনে রাখা উচিত যে যুক্তিসঙ্গত প্রকল্প দ্বারা সঠিকভাবে নিয়োজিত পরীক্ষণ পরিচালনা করে কোন ফল না পাওয়া গেলেও ঐ বিশেষ সাধনার মূল্য কমে যায় না।

এ ধরনের পরীক্ষণ দ্বারাই এসব প্রকল্পের মূল্য সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর। গত কয়েক বছর ধরে আবহাওয়া পরিবর্তন করার প্রচেষ্টার ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের আশা-ভরসা বেশ যেন ঝিমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। তাই বলে ইচ্ছেটা কিন্তু এখনও এদের মন থেকে একেবারেই মুছে যায়নি। যুক্তিতর্ক দিয়ে আজও একথা বলা যেতে পারে যে ভালভাবে এসব ব্যবস্থার কারণগুলো বুঝতে পারলে এসব ঝড়ের পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

অষ্টম অধ্যায়

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

গত বিশ বছর ধরে আমরা বজ্রঝড় সম্পর্কে বহুকিছু শিখেছি। এ ধরনের শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে আমাদের অজ্ঞতা যেন প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। কিছু দিন আগেও আমরা এ সম্পর্কে নানারূপ অস্বাভাবিক প্রশ্নের অবতারণা করেছি। এখনকার প্রশ্নগুলো কিছুটা সঠিকভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। আমরা নতুন নতুন প্রকল্প তৈরী করে এগুলো এখন পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের চরম উন্নতি সাধিত হয়। দ্রুতগতি সম্পন্ন কমপিউটার যন্ত্র দ্বারা আজকাল খুবই দুরূহ সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করা যায়। পর্বত প্রমাণ পর্যবেক্ষণের ফলাফল খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসব যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ সম্ভবপর।

বায়ুমণ্ডলীয় গুণাবলী নির্ণয় করার জন্য আজকাল অনেক সুদক্ষ যন্ত্রপাতি নানাভাবে অহরহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ কাজের জন্য বহু ধরনের রাডার যন্ত্রও তৈরী হয়েছে। আমরা এখন এসব যন্ত্র দিয়ে মেঘবিন্দু বৃষ্টিবিন্দু তুষারের স্ফটিক এবং শিলার উপস্থিতি নির্ণয় করে সেগুলোর গতিপথও নির্ণয় করতে সক্ষম হই। বিজলীপাতের স্থান নির্ণয় করে তার গুণাবলী পর্যন্ত আজকাল রেকর্ড করা সম্ভবপর।

নানা ধরনের আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত বিমান, উচ্চস্তরে ভাসমান বেলুন ও আবহাওয়া বিষয়ক উপগ্রহের অহরহ ব্যবহারের কথা আজকাল সর্বজনবিদিত।

এ থেকে মনে হয় যে অবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে তার ফল ভোগ করার জন্য আমরা যেটুকু ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি তাও কিছুটা বজ্রঝড়ের কুয়াশাচ্ছন্ন তথ্য আবিষ্কারের মতোই সীমিত বলে মনে হয়। বজ্রঝড় পরিকল্পনার উপর বেশী সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আজও কাজ করছেন না বলে এ বিষয়ের দ্রুত উন্নতির পথ এখনও বন্ধ হয়ে আছে।

BANSDOC Library
Accession No. 18566

বায়ুমণ্ডলীয় পদার্থবিদ্যা সাধনা এবং বিশেষ করে বজ্রঝড়ের উপর গবেষণা কাজগুলো সত্যি খুবই চমকপ্রদ ও উত্তেজনামূলক ব্যাপার। এ বিষয়ের কতকগুলো সাধারণ প্রশ্নের উপরও নানারূপ গবেষণার কাজ পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ কাজের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য কঠিন পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল মনসম্পন্ন অনেক লোকের আরও সাধনার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান

বর্তমানকালে বজ্রঝড়ের সমস্ত বিষয়ের উপর পৃথিবীর বহুদেশে গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রায় সব জায়গাতেই বিভিন্ন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এসব কাজে স্বাভাবিক ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজলীপাতের কারণের উপর কেউ বা শিলার উপর আবার কেউবা মেঘ বৃষ্টির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদা করে কাজ করে চলেছেন। প্রতিটি স্তরের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের কাজের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রমশঃ এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন গবেষণাগুলোর তুলনায় এ বিষয়ে পরিচালিত একটি বড় রকমের সংস্থার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৬০ সাল যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া সংস্থা থেকে "জাতীয় মারাত্মক ঝড় পরিকল্পনা" বলে একটি বিরাট গবেষণা সংস্থার কাজ শুরু হয়। এই সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম হোল এন. এস. এস. পি.। ১৯৫৬ সালে শুধুমাত্র একটি পি-৫১ বিমানে যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত করে মারাত্মক বজ্রঝড়ের নিকটবর্তী স্থানে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করে এই পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম কার্যকরী করা হয়। এই বিশেষ পি-৫১ বিমানটির পরিচালক ছিলেন টেক্সাসের জেমস ক্রক ও জ্যাক্স বোরো নামক দুজন সুদক্ষ বৈমানিক।

এরপর সত্বরই জানা গেল যে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করতে গেলে আরও বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজন।

১৯৬৩ সালের মধ্যে এ পরিকল্পনাটি আরও বড় রূপ ধারণ করে। অন্যান্য সরকারী বেসরকারী বিভাগের লোকেরাও আবহাওয়া সংস্থার এই

বিশেষ পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিকল্পনায় সক্রীয়ভাবে অংশ নেন। এ পরিকল্পনার পরিচালক সি. এফ. ভ্যান থুলেনার প্রধান বৈজ্ঞানিক চেষ্টায় নিউটনের সাহায্যে ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের পরামর্শে এ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া সংস্থা থেকে যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত দুটো Dc-6 বিমানও এ ব্যাপারে নিয়োজিত করা হয়। বজ্রঝড়ের ভিতরে ও বাইরের নানা ধরনের পরিমাপক সংগ্রহ করার জন্য এই বিমানগুলো ব্যবহৃত হয়। উক্ত মণ্ডলীয় পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য সুদক্ষ যন্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত আর একটি বি-৫৭ বিমানও এ কাজে নিয়োগ করা হয়।

আবহাওয়া সংস্থার বিমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী, কেন্দ্রীয় বিমান চালনা সংস্থা জাতীয় বিমান ও মহাশূন্য অভিযান সংস্থা থেকে এ সব ঝড়ের মধ্যে নানা ধরনের বিমান ব্যবহার করে এ পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করা হয়। ১৯৬১ সালে বসন্তকালের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে ১৩-টি বিমান ১০৭-টি উড্ডয়নের ফলাফল রেকর্ড করতে সক্ষম হয়।

Nssp-এর সমস্ত বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীরা বড় বড় বজ্রঝড়ের উপরের অংশের টারবুলেন্স লক্ষ্য করার জন্য বেশী ব্যস্ত ছিলেন। রয় স্টেনার ও রিচার্ড এইচ. রাইন নামক Nasa-এর দুইজন বৈজ্ঞানিক ১৯৬০-৬১ সালে বিমান বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত বজ্রঝড়ের মাঝ দিয়ে শব্দের চেয়ে কম গতিসম্পন্ন বিমান ও শব্দের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বিমান চালনার ফলাফলগুলো বিশেষভাবে গবেষণা করেন। এ সমস্ত বিমান ২৫,০০০ ফুট থেকে ৪০,০০০ ফুট স্তরের প্রতি ৫,০০০ ফুট পর পর উড্ডয়ন সমাপন করে।

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিমান বাহিনীর পি-৬১ বিমান দ্বারা বজ্রঝড়ের মাঝে বিমান চালনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। আজকের জন্য একথা একইভাবে প্রযোজ্য হবে। ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে কোন জেট বিমান যদি একটি বড় ধরনের বজ্রঝড় ভেদ করে অগ্রসর হতে চায় তাহলে তার মাঝে খুব মারাত্মক ধরনের টারবুলেন্সের সম্ভাবনা থাকবে সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় বিমানের কিছু অংশ খুলে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া শিলাপাতের সম্ভাবনা খুব কম ব্যাপার নয়ঃ

বড় বড় শিলার টুকরা দ্রুত গতিসম্পন্ন জেট বিমানের বাইরের অংশ থেকেও যেতে পারে। বড় রকমের শিলার টুকরা কোন রকমে জেট ইঞ্জিনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিমানের যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাবে।

স্টেনার ও রাইন তাঁদের গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে খুব মারাত্মক বজ্রঝড়ের সময় বায়ুর উর্ধ্বপ্রবাহের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০০ ফুটের মতো হতে পারে। (অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৩৬ মাইল।) এঁরা আরও জানান যে ৪০,০০০ ফুটের স্তরে টারবুলেন্সের পরিমাণ নিম্নস্তরের টারবুলেন্সের তুলনায় অনেক বেশী হয়।

বিমান চালনা ছাড়াও Nssp থেকে আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। খুব আধুনিক ধরনের নানারূপ আবহাওয়া রাডার দিয়ে এসব মারাত্মক বজ্রঝড় পর্যবেক্ষণের পরিচালনা করা হয়। ১৯৬৩ সালের বসন্ত কালের মধ্যে ওকলাহোমা প্রদেশের আশেপাশে ন্যূনপক্ষে ৬-টি বিভিন্ন ধরনের রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ ধরনের ঘন ঘন রাডার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ওকলাহোমা আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে আরও আবহাওয়া রাডার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বিস্তৃত আছে।

১৯৫১ সালে আবহাওয়া সংস্থা থেকে ওকলাহোমা, টেক্সাস ও ক্যানসাসে কতগুলো ঘন ঘন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৬১ সালে প্রতি ৩০ মাইল পর পর ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত স্বয়ংক্রীয় আবহাওয়া যন্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ২০০-টি আবহাওয়া কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। এসব যন্ত্র দ্বারা চাপ এবং বহু স্থানে বায়ুর তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও রেকর্ড করা হয়। এ সমস্ত স্থানের মধ্যে আবার আরও ঘণীভূত প্রতি ১০ থেকে ১৫ মাইল পর পর সাজানো আরও ৩৬-টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এসব কেন্দ্রে পূর্বে বর্ণিত সমস্ত পরিমাপগুলো ছাড়াও বায়ুর গতি নির্ণয়ের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

অবশেষে Nssp থেকে বেলুন দিয়ে পরিচালিত উচ্চস্তরের বায়ুর চাপ, তাপ ও আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রপাতিরও ব্যবহার শুরু হয়। খুব দূরে দূরে

অবস্থিত দিনে দুবার করে পর্যবেক্ষণে রত এ ধরনের কেন্দ্রগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শূন্যস্থান পূরণের জন্য এসব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

একথা সত্য যে এ ধরনের বিরাট পরিকল্পনার মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর। এ সমস্ত তথ্য কারা বিশ্লেষণ করছে? বিভিন্ন ধরনের সরকারী ও বেসরকারী ও বৈজ্ঞানিক সংস্থা থেকে বহু বৈজ্ঞানিক এসব তথ্যের বিশ্লেষণের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন।

ভবিষ্যৎ

বায়ুমণ্ডল বিষয়ক বৈজ্ঞানিকরা বজ্রঝড় সম্পর্কে বহু অমীমাংসিত তথ্যের সঠিক উত্তর পাবার জন্য জাতীয় মারাত্মক বজ্রঝড় পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলাফলের উপর আশা করে আছেন। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বজ্রঝড়ের মাঝে ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানের অবস্থা সম্পর্কে বহু কিছু জানা যেতে পারে। সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেঘ গঠন, বৃষ্টি, শিলা, বিজলী-পাত ও টর্নেডো সম্পর্কে নানারূপ ভিন্ন-মুখী প্রকল্পগুলোর সঠিক সমাধানও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এ বিরাট পরিকল্পনা থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য ছোট ছোট জ্ঞান সম্ভারের সমষ্টি দিয়ে সম্ভবতঃ সত্বরই আমরা বজ্রঝড় সম্পর্কে একটা বাস্তব ধর্মী সঠিক ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হব। এটা অবশ্য একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক দক্ষতার মাধ্যমে এর জন্য অনেকগুলো বিক্ষিপ্ত ধারণাকে একটা যুক্তিযুক্ত বিরাট ধারণার আকারে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে হবে।

মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের এই বিরাট পাহাড় অতিক্রম করার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকের কাছে এটা একটা মস্তবড় চ্যালেঞ্জ।

বজ্রঝড় সম্পর্কে সবকিছু পুরোপুরি ভাবে জানতে পারলে এগুলো পরিবর্তন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমরা যে-সব চেষ্টা করেছি সেগুলো সবই সার্থক হয়নি বটে তবে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার জন্য এই ব্যর্থতাকে খুব একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার

বলে মনে করা ভুল হবে। মারাত্মক বজ্রঝড় সৃষ্টির প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলে এসব ঝড়ের প্রতিটি স্তরের গঠন প্রণালীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থার সৃষ্টির করে আমরা পরে এসব ঝড়ের নানারূপ পরিবর্তন সাধন করাতেও সক্ষম হব। এ প্রচেষ্টার নানারূপ উপকারের কথা চিন্তা করলে আমাদের মাঝে বেশী করে প্রেরণার সৃষ্টি হবে—এবং তারজন্য হয়তোবা এই বিশেষ লক্ষ্যটি অর্জন করতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না।

LIBRARY
Dhaka